
মুজতবা আলীর
শ্রেষ্ঠ গল্প

সৈয়দ মুজতবা আলীর

শ্রেষ্ঠ গল্প



ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
৩/১০, লিয়াকত এভেন্যু (ভিক্টোরিয়া পার্ক), ঢাকা-১

SYED MUJTABA ALIR
SRESTHA GALPA
BY
DR. SYED MUJTABA ALI

Rs. 4.00

প্রথম পাকিস্তানী সংস্করণ—চৈত্র : ১৩৬৮
"For sale and circulation in Pakistan only"
"কেবল পাকিস্তানে বিক্রয় ও বিতরণের জন্য"

প্রকাশক :
রুহুল আমিন নিজামী
ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
৩/১০, লিয়াকত এভেন্যু,
(ভিক্টোরিয়া পার্ক), ঢাকা-১

মুদ্রাকর :
এ, আর, খান
ইডেন প্রেস
৪২/এ, হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩

॥ মূল্য : চার টাকা ॥

—পরম শ্রদ্ধেয়া

শ্রীযুক্তা রাধারাণী মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে—

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলীর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সঞ্চয়নে গল্প আছে বারোটি। পাকিস্তানী সংস্করণে দু'টো গল্প বাড়ানো হয়েছে। এই সঞ্চয়নে প্রকাশিত কোন গল্প পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলীর অন্য কোন গ্রন্থে ছাপা হয়নি।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

এই লেখকের—

দেশে বিদেশে

পঞ্চতন্ত্র

চাচা কাহিনী

ময়ূরকণ্ঠী

শব্‌নম্

জলে ডাঙায়

চতুরঙ্গ

ধূপ ছায়া

অবিশ্বাস্য

ভবঘুরে ও অন্যান্য

॥ নোনাজল ॥

সেই গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজ। ত্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারব, কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান, মুরগীর খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন্ জায়গায়। অথচ আমি জাহাজের খালাসী নই—অবরের-সবরের যাত্রী মাত্র।

ত্রিশ বৎসর পরিচয়ের আমার আর-সবই বদলে গিয়েছে, বদলায়নি শুধু ডিসপ্যাচ স্টীমারের দল! এ-জাহাজের ও-জাহাজের ডেকে-কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সব কটা জাহাজের গন্ধটি হুবহু একই! কী রকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা, আর যে-গন্ধটি আর সব-কিছু ছাপিয়ে ওঠে, সেটা মুরগী-কারি রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আস্ত মুরগী, তারই পেটের ভেতর থেকে যেন তারই কারি রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গন্ধ তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, যে কোন স্টেশনে পৌঁছনো মাত্রই পাওয়া যায়। পুরনো দিনের রূপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে, শুধু লক্ষ্য করলুম ভিড় আগের চেয়ে কম।

দ্বিপ্রহরে পরিপাটি আহারাদি করে ডেকচেয়ারে শুয়ে দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবি ঠাকুর চোখে সেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই আমি চাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রমোফোনের বাক্স। পোর্টে-বলটা আনব আনব করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা

মর্দিতা 'দেশ' পত্রিকা। মালিক না আসা পর্যন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিৎ 'ভ্রষ্টা'ও হয়ে যান, তা হলেও 'স্বামী' বিশেষ বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই।

'রূপদর্শী' ছদ্মনাম নিয়ে এক নূতন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি দরদ-ভরা লেখা ছেড়েছে। ছোকরার পেটে এলেম আছে, নইলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কি করে, আর এত সব কেচ্ছা-কাহিনীই বা যোগাড় করল কোথা থেকে? আমি তো একখানা ছুটির আরজি লিখতে গেলেই হিমশিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এত বড় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেয় না কেন? হুঁঃ! এ আবার একটা কথা হল! সিলেট-নোয়াখালীর আনাড়ীরা দেবে ঘুঘু ইংরেজের সঙ্গে লড়াই—আমিও যেমন!

জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি। সিল্কের লুঙ্গি, চিকনের কুর্তা আর মুগার কাজ-করা কিস্তি-টুপি পরে ডেকের ওপর টহল দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছেও। ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাছ—একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, 'রূপদর্শী' দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি।

একটুখানি গলা খাঁকরি দিয়ে শুধালুম, 'ও সারেঙ সাহেব, জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো?

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে বললে, 'আমাকে "আপনি" বলবেন না সাহেব। আমি আপনাকে দু-একবারের বেশী দেখিনি কিন্তু আপনার আব্বা সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা এ-গরীবকে মেহেরবানি করেন।'

খুশী হয়ে বললুম, 'তোমার বাড়ি কোথায়? বোস—না, তার ফুরসত নেই?'

ধপ্ করে ডেকের উপর বসে পড়ল।

আমি বললুম, 'সে কী? একটা টুল নিয়ে এস। এসব আর আজকাল'—কথাটি শেষ করলুম না, সারেঙও টুল আনল না। তারপর আলাপ-পরিচয় হল। দ্যাশের লোক—সুখ দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়ল না। শেষটায় মোওকা পেয়ে 'রূপদর্শী-দর্শন' তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালুম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা যে-রকম পুঁথিপড়া শোনে, সে-রকম আগা-গোড়া শুনল, তারপর খুব লম্বা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

আল্লাতালার উদ্দেশে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'ইন-সাফের (ন্যায়ধর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, কিন্তু এ-দুনিয়ায় ইনসাফ কোথায়? আর বে-ইনসাফি তো তারাই করেছে বেশী, যাদের খুদা ধনদৌলত দিয়েছেন বিস্তর। খুদাতালাই কার জন্যে কি ইনসাফ রাখেন, তাই বা বুঝিয়ে বলবে কে? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল?'

আমেরিকার কথায় মনে পড়ল। 'চৌতলি পরগনায় বাড়ি, না, যেন ওই দিকেই কোন্‌খানে।'

সারেঙ বললে, 'আমারই গাঁ ধলাইছড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছিল, ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকেই। আমরা খিদিরপুরে সইন (sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলাম—একই দিন একই সঙ্গে।'

আমি শুধালাম, 'কি হল তার? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

সারেঙ বললে—'শুনুন—

'যে-লেখাটি হুজুর পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক। কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কী জান-মারা খাটুনি তার খবর কেউ কখনও দিতে পারবে না, যে সে-জাহান্নামের ভিতর দিয়ে কখনও যায়নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে

যে-লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কি রকম ঘাম ঝরে দেখেছেন—এই জাহাজেই যার হুদিক খোলা, পদ্মার জোর বাতাসের বেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে আনাগোনা করতে পারে। এ তো বেহেশ্‌ৎ। আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নীচে যেখানে এঞ্জিন-ঘর, তার সব দিক বন্ধ, তাতে কখনও হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। সেই দশ-বারো-চৌদ্দ হাজার টনী ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনও অনুমান করা যায়? খাল বিল নদীর খোলা হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহান্নামের মাঝখানে, কালো-কালো বিরাট বিরাট শয়তানের মত কলকব্জা, লোহালক্কড়ের মুখোমুখি।

'পয়লা পয়লা কামে নেমে সবাই ভিরমি যায়। তাদের তখন উপরে টেনে জলের কলের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো নুন গেলানো হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব নুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন বাঁচতে পারে না।

'কিংবা দেখবেন কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বেলচা ফেলে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে, খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজী বুলিতে একেই বলে "এমখ"—'

আমি শুধালুম, 'একেই কি ইংরিজীতে বলে এমাক্ (amuck)? কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে!'

সারেঙ বললে, 'জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে খুন করতে আসে।' তারপর একটু থেমে সারেঙ বললে, 'আমাদের সক্কলেরই দু-একবার হয়েছে, আর-সবাই জাবড়ে ধরে জলে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—শুধু সমীরুদ্দী

কখ্খনো একবারের তরেও কাতর হয়নি। তাকে আপনি দেখেছেন সায়েব? বাং মাছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুর্চির ওজন ছিল তিন মণের কাছাকাছি—তাকে সে এক থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারত। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে জমে ছিল বাঘের থাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিরমি যায়নি, "এমখ" হয়নি, তার কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল' যে করেই হোক পয়সা সে কামাবেই কামাবে, ভিরমি গেলে চলবে না, বিমারি পাকড়ানো সখ্ৎ মানা।'

সারেঙ বললে, 'কি বেহদ তকলীফে জানপানি হয়ে যে কুলুম শহর পৌঁছলাম—,

আমি শুধালুম, 'সে আবার কোথায়?'

বললে, 'বাংলায় যারে লঙ্কা কয়।'

আমি বললুম, 'ও, কলম্বো।'

'জী। আমাদের উচ্চারণ তো আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি কুলুম শহর। সেখানে ডাঙায় বেড়াবার জন্য আমাদের নামতে দিল বটে, কিন্তু যারা পয়লা বার জাহাজে বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের অসহ্য কষ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরুদ্দী বন্দরে নামলেই না। বললে, নামলেই তো বাজে খরচা। আর সে-কথা ঠিকও বটে হুজুর, খালাসীরা কাঁচা পয়সা বন্দরে যা ওড়ায়! যে জীবনে কখনও পাঁচ টাকার নোট দেখেনি, আধুলির বেশী কামায়নি, তার হাতে পনেরো টাকা! সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।

'আমরা পেট ভরে যা-খুশী তাই খেলাম! বিশেষ করে শাক-সবজি। জাহাজে খালাসীদের কপালে ও-জিনিস কম। নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।

'তারপর কুলুম থেকে আদন বন্দর।'

আমার আর ইংরিজী 'এইড্‌ন্‌' বলার দরকার হল না।

'তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে সুসোর খারি—দু দিকে ধু-ধু মরুভূমি, বালু আর বালু মাঝখানে ছোট্ট একটা খাল।'

বুঝলুম 'সুসোর খাড়ি' মানে সুয়েজ কানাল।

'তারপর পুর্সই। সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাক-সবজি খেতে নামলাম সেখানে। ঝানুরা গেল খারাপ জায়গায়।'

পোর্ট সঈদের গণিকালয় যে বিশ্ববিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে-খবরটি রাখে।

'পুর্সই থেকে মার্সই, মার্সই থেকে হামবুর—হামবুর—জর্মনির মুলুকে।'

ততক্ষণে সিলেটী উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কি ধ্বনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে, তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুর্গের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসী-জর্মন থেকে শুনে শিখেছে, তারা যে-রকম উচ্চারণ করে, ইংরিজীর বিকৃত উচ্চারণের মারফত নয়।

সারেঙ বললে, 'হামবুরে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল গাদাই করে আমরা দরিয়া পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম নুউক বন্দরে—মিরিকিন মুল্লুকে।

'নয়া ঝুনা কোন খালাসীকেই নুউক বন্দরে নামতে দেয় না। বড় কড়াকড়ি সেখানে। আর হবেই বা না কেন? মিরিকিন মুল্লুক সোনার দেশ। আমাদের মত চাষাভুষাও সেখামে মাসে পাঁচ-সাত শো টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশ-কালা আদমীও সেখানে তার চেয়েও বেশী কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সব কটা ভেগে গিয়ে তামাম মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণ ভরে টাকা কামাবে। তাতে নাকি মিরিকিন মজুরদের জবর লোক-

সান হয়। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দী।

'নুউক পৌঁছবার তিন দিন আগে থেকে সমীরুদ্দীর করল শক্ত পেটের অসুখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভাণ করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলি করেনি বলে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার হুকুম দিলে।

'নুউক পৌঁছবার দিন সন্ধ্যেবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসম-কিরে খাইয়ে কানে কানে বললে, সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কি কৌশলে সে পাড়ে পৌঁছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে বললে।

'বিশ্বাস করবেন না সাহেব, কি রকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে তৈরী করেছিল। কলকাতার চোরা-বাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রঙের সুট, টাইকলার, জুতা মোজা।

'আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেক্‌চি যোগাড় করে দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী সাঁতারের জাঙিয়া পরে নামল জাহাজের উলটো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেকচির ভিতরে তার সুট জুতা মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেকচি ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, ডেক্‌চি জলে ডুবিয়ে দিয়ে সে শিস দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভিতর। সেখানে আমাদেরই এক সিলেটী ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুলিশের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তার-পর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে নুউক থেকে বহুদূরে, যেখানে সিলেটীরা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিশের

হাতে ধরা পড়ার যে কোনও ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার স্যুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিশ দেখলেও ভাববে, সে নুউকবাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে।

'পেলেনটা ঠিক উতরে গেল, সায়েব! সমীরুদ্দীর জন্য খোঁজ্ খোঁজ্ রব উঠল পরের দিন দুপুরবেলা। ততক্ষণে চিড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয়, সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও। একদম না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখীকে পেলেও পেওয়া যেতে পারে, কিন্তু নুউক শহরের ভিতর সমীরুদ্দীকে খুঁজে পাবে কোন্ পুলিশের গোঁসাই?'

গল্প বলায় ক্ষান্ত দিয়ে সারেঙ গেল জোহরের নমাজ পড়তে। ফিরে এসে ভূমিকা না করেই সারেঙ বললে, তারপর হুজুর, আমি পুরো সাত বছর জাহাজে কাটাই। দু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুরসত হয়ে ওঠেনি। আর কী-ই বা হত গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। যতদিন বেঁচে ছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম—বুড়া শেষের ক বছর সুখেই কাটিয়েছে—খুদাতালার শুকুর—বুড়ী নাকি আমার জন্য কাঁদত। তা, হুজুর, দরিয়ার অথৈ নোনা পানি যাকে কাতর করতে পারে না, বাড়ির দু ফোঁটা নোনাজল তার আর কী করতে পারে বলুন!'

বলল বটে হক কথা, তবু সারেঙের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ বললে, 'যাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খবর কিংবা গুজব, যাই বলুন, শুনেছি, সমীরুদ্দী বহুত পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরিকিন মুল্লুকে, দেশে ফেরার' কোন মত লব নেই। তাই নিয়ে আমি আফসোস করিনি, কারণ খুদাতালা যে

কার জন্য কোন্ মুল্লুকে দানাপানি রাখেন, তার হদিস বাতলাবে কে?

'তারপর কল-ঘরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেল আমার পায়ের হাড্ডি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসে ঢুকলাম ডিসপ্যাচের কামে। এ জাহাজে আসার দুদিন পরে, একদিন খুব ভোরবেলা, ফজরের নমাজের ওজু করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাজ্জব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী! বুকে জাবড়ে ধরে তাকে বললাম, "ভাই সমীরুদ্দী!" এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপন ভাইয়ের মতন কতই না প্যার করেছি।

'কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশী তাজ্জব লাগল আমার, সে আমার কোনও প্যারে সাড়া দিল না বলে। গাঙের দিকে মুখ করে পাথরের পুতুলের মত বসে রইল সে। শুধালাম, তোর দেশে ফেরার খবর তো আমি পাইনি। আবার এ জাহাজে করে চলেছিস তুই কোথায়? কলকাতা? কেন? দেশে মন টিকল না?

'কোন কথা কয় না। ফকির-দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায়নি।

'বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। তখনকার মত তাকে আর কথা কওয়াবার চেষ্টা না করে ঠেলেঠুলে কোন গতিকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে। নাশতার পেলেট সামনে ধরলাম আণ্ডা ভাজা ও পরটা দিয়ে সাজিয়ে—ওই খেতে সে বড় ভালবাসত—কিচ্ছু মুখে দিতে চায় না। তবু জোর করে গেলালাম, বাচ্চাহারা মাকে মানুষ যে রকম মুখে খাবার ঠেসে দেয়, কিন্তু হুজুর, পরের জন্য অনেক কিছু করা যায়, জানতক কুরবানি দিয়ে তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু পরের জন্য খাবার গিলি কি করে?

'সেদিন দুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালন্দে নামতে দিলাম

না। আমার হুজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—নুউক বন্দরেও আমাদের যখন নামতে দেয়নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।

'রাত্রের অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মুখ ফুটল।

'হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করল, কি ঘটেছে।'

সারেঙ দম নেবার জন্য না অন্য কোন কারণে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না। বললে, 'তার সে দুঃখের কাহিনী ঠিক ঠিক বলি কি করে সাহেব? এখনও মনে আছে, কেবিনের ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে সে আমাকে সব কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিন্ধেছিল, আর অতি অল্প কথায়ই সে সব-কিছু সেরে দিয়েছিল।

'সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে। বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানিনে, একসঙ্গে কখনও দেখেনি—'

আমি বললুম, 'আমিও জানিনে, আমিও দেখিনি।'

'তবেই বুঝুন হুজুর, সে-টাকা কামাতে হলে কটা জান কুরবানি দিতে হয়।

'প্রথম পাঁচ শো টাকা পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ি ছাড়াতে। তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ির পাশের পতিত জমি কেনার জন্য। তারপর আরও অনেক টাকা দীঘি খোদাবার জন্য, তারপর আরও বহুত টাকা শহুরী ঢঙে পাকা চুন-কাম-করা, দেড়য়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্য, আরও টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই,, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্য এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টঙিঘরের উল্টোদিকে দীঘির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্য।

'সাত বচ্ছর ধরে সমীরুদ্দী মিরিকিন মুল্লুকে অসুরের মত খেটে দুই শিফ্‌ট আড়াই শিফ্‌টে গতর খাটিয়ে জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজগার, আর আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরিকিন মুল্লুকের ভিখারীরও দিন গুজরান হয় না।

'সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ি বানাবার জন্য, জমি কেনার জন্য। মিরিকিন মুল্লুকের মানুষ যে-রকম চাষবাসের খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশানের বাড়িতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।

'ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরী শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। নুউক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ী কালা আদমীও বিনা তকলিফে। তার ওপর সমীরুদ্দী হরেক রকম কারখানার কাজ করে করে কলকব্জা এমনি ভাল শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জোরে জাহাজে আরামের চাকরি করে ফিরল খিদিরপুর। সন্ধ্যের সময় জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে গেল শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌঁছল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাইছড়ার দিকে—আট মাইল রাস্তা, ভোর হতে না হতেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।

'রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানখেত, তারপর ধলাইছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছতে হয়।

'বিহানের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পৌঁছল ধানখেতের মাঝখানে।

'মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল—কারণ

মসজিদের নক্শাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরী ইঞ্জিনিয়ার, আর হুজুরও মিশর মুল্লুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হুজুর দেখেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।

'কত দূর-দরাজ থেকে সে-মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমিও জানি, সমীরুদ্দীও জানে।

'মিনার না দেখতে পেয়ে সমীরুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে দেখে—কোথায় দীঘি, কোথায় টাইলের টঙিঘর!'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, 'সে কি কথা!'

সারেঙ যেন আমার প্রশ্ন শুনতেই পায়নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের ঠেকনায় খাড়া, আজ দেখে ছটা ঠেকনা। তবে কি ছোট ভাই বাড়ি-ঘরদোর গাঁয়ের অন্য দিকে বানিয়েছে? কই, তা হলে তো নিশ্চয়ই সে-কথা কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত। এমন সময় দেখে গাঁয়ের বাসিত মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করেন। সমীরুদ্দীকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

'প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চাননি। পরে সমীরুদ্দীর চাপে পড়ে সেই ধানখেতের মধ্যিখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে। গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া, মেয়েমানুষ আরও কত কী!'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'বল কি সারেঙ! এ-রকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে? কিন্তু বল দিকিনি, গাঁয়ের কেউ

তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন?'

সারেঙ বললে, 'তারাই বা জানবে কি করে, সমীরুদ্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরুদ্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফুর্তি-ফার্তির জন্য তারই কিছুটা পাঠায়। সমীরুদ্দীর চিঠিও সে কাউকে দিয়ে পড়ায়নি—সমীরুদ্দী নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গাঁয়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়াবার বহর দেখে তাকে বাড়ি-ঘরদোর বাঁধতে, জমি খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড় ভাই বিয়ে-শাদী করে মিরিকিন মুল্লুকে গেরস্থালি পেতেছে, এ-দেশে আর ফিরবে না। আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা, তিন দিনের ভিতর দশ—খান বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে।'

আমি বললুম, 'উঃ! কী পাষণ্ড! তারপর?'

সারেঙ বললে, 'সমীরুদ্দী আর গাঁয়ের ভিতর ঢোকেনি! সেই ধানখেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে। সমীরুদ্দী আমাকে বলেনি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরেনি। শুধু বলে-ছিল, যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।

'কলকাতার গাড়ি সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গাঁয়ের মুরুব্বীরা তার ভাইকে নিয়ে এলেন স্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে সেদিন গাঁয়েই ছিল। সমীরুদ্দীর দুপা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে। আরও পাঁচজন বললেন, "বাড়ি চল্, ফের মিরিকিন যাবি তো যাবি, কিন্তু এতদিন পরে দেশে এসেছিস, দুদিন জিরিয়ে যা"।

আমি বললুম, 'রাস্কেলটা কোন্ মুখ নিয়ে ভায়ের কাছে এল সারেঙ?'

সারেঙ বললে, 'আমিও তাই পুছি। কিন্তু জানেন সায়েব, সমীরুদ্দী কি করলে? ভাইকে লাথি মারলে না, কিছু না, শুধু বললে, সে বাড়ি ফিরে যাবে না।

'তার পরদিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা। আপনাকে তো বলেছি, শা-বন্দরের বারুণীর পুতুলের মত চুপ করে বসে।'

দম নিয়ে সারেঙ বললে, 'অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দী আমাকে সব কিছু বলেছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে যা আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছিল, তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, "ভিখিরী স্বপ্নে দেখে, সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার সেই পুরনো দুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি-ঘরদোর বানিয়ে হয়েছিলাম বড়লোক, সেই দুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলাম কোথায়" ?'

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হত, স্বপ্ন হত তবে এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু আমি যখন যা শুনেছি তাই লিখছি তখন সারেঙের বাদবাকি কাহিনী না বললে অন্যায় হবে।

সারেঙ বললে, 'চোদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরুদ্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝরিয়েছিল।

'কিন্তু ওই যে ইনসাফ বললেন না হুজুর, তার পাত্তা দেবে কে?

'সমীরুদ্দী মিরিকিন মুল্লুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায়নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজে মারা যায়। ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পৌঁছল সেই ভাইয়েরই কাছে। আবার সে টাকাটা ওড়াল।

ইনসাফ কোথায়?'

পদটীকা

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাটান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা ছেলেভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরিজী স্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরিজী শিক্ষার জয়-জয়কাল পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্য-তীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা যাঁরা কোনো-গতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশী কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনো কোনো স্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাশীর চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেননি—পালপরব শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাঙলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল, অকৃত্রিম

অশ্রদ্ধা—ঘৃণা বললেও হয়ত বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজী হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনায় 'দোলা লাগা,' 'পাখী জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা—সে দিন কাজে লেগে গিয়েছিল। এবং তার পর মুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু ক উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।'

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশী এবং টেবিলের উপর পা দু'খানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশী। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিতমশাইকে খুশী করবার পন্থা বাড়ন্ত হলে ঐ বিষয়টি নূতন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশী স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই, ঐ 'দোলা-লাগা, পাখী-জাগা'ই আমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে একমাত্র গোমাংস ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানা প্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে। 'অনার্য', 'শাখামৃগ, 'দ্রাবিড়সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণতঃ সম্বোধন করতেন না; তা ছাড়া এমন সব

অশ্লীল কথা বলতে যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে। এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মনস্থির করতে পারিনি যে সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি, কোন্‌টা বেশী হয়েছে।

পণ্ডিতমহাশয়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত—অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন, আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্র বারের মত স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে কোনো একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে-দিন কোনো অজুহাতই পেতেন না—ধর্মসাক্ষী সে-কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু' চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায়—আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, 'কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মত নিষ্ফল নয় কি?' তারপর কখনো আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড়বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টানা-পাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত

শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস পণ্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান—এ কথা অস্বীকার করার যো নেই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজো যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা-তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে-পড়া, টিকিতে দোলা-লাগা কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ, আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন?

সে-সময়ে আসামের চীফ-কমিশনার ছিলেন এন. ডি. বীটসন্ বেল্। সায়েবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে তাঁর নাম, আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'। 'এন. ডি'তে হয় 'নন্দদুলাল' আর বীটসন্ বেল্ অর্থ বাজায় ঘণ্টা'—দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে।

ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সে-ই একদিন খবর দিল লাট সাহেব আসছেন ইস্কুল পরিদর্শন করতে—পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের টুর ক্লার্ক না কি, সে তাঁর কাছ থেকে পাকা খবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। একদিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে

লাট আসার উত্তেজনায় খিট খিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টারমশায়ের মেজাজ যখন সকলের প্রাণ ভাজা ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার স্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কীনাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সে দিকেই হেডমাস্টার। নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজ ভাই আছেন, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বললে, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন কি হয়েছে?'

'দেখেই আয় না ছাই।'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেড-মাস্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড! আমাদের পণ্ডিতমশাই একটা লম্বা হাতা আন্‌কোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদ বাকি মাস্টাররা কলরব করে সে-গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন। নানা মুনি নানা গুণকীর্তন করছেন; কেউ বলছেন পণ্ডিতমশাই কি বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা, পণ্ডিত-মশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তি ছিল না), কেউ বলছেন আহা, যা মানিয়েছে (হাতী, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মত দেখাচ্ছিল), কেউ বলছেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট অফিট কি?)। শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভশ্চায, এ রকম উম্‌দা গেঞ্জি

স্রেফ দু'খানা তৈরী হয়েছিল, তার-ই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানী দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর কারো কপালে এ রকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাশী নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেণ্ড পিরিয়ডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবী শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সায়েব আসছেন, শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিতমশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্যই আমরা তখন তৈরী কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠ্‌তে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ডর ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীবকণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে

পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাস খ্যাস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তড়পায় শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনো করুণকণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গব্ব-যন্ত্রণা,' কখনো এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়মিড় খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন—লাট সায়েবের সামনে তো সর্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সায়েব এলে আমি জানালা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না হয় ফের পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গব্ব-যন্ত্রণাটা খুলছিনে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।' আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশায়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই; শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহ-ভরা চোখে বললেন' 'তুই তো একটা আস্ত মর্কট—শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম।

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশী ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্ত-দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে

সর্বাঙ্গ খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোনো বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম, কোন্ দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা, তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময় মত ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তাঁর 'গব্ব-যন্তুণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন; সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইন্‌স্‌পেকটর, হেডমাস্টার, নিত্যানন্দ—আর লাট সায়েবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পানডিট্' বলে সায়েব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সর্ব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন—এই অনাদৃত পণ্ডিত শ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেলেও যে কি রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃৎ-তদ্ধিতের বাই জানতেন; তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাট সায়েব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম, প্লীজ'। লাট সায়েব আমাদের বলল 'প্লীজ', এ কী কাণ্ড! তখন আবার আর কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন 'বিহঙ্গ' আমরা চুপ,—তখনো প্লীজের ধকল কাটেনি! শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁঠা যতোটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে

নয় দেশে নাম করে ফেলল—আমরা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সায়েব ততক্ষণে হেডমাস্টারের সঙ্গে 'পণ্ডিত' শব্দের মূল নিয়ে ইংরিজীতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাস্টার কি বলেছিলেন জানিনে তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পণ্ড হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব পণ্ডের ইতিহাস হয়ত রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,—না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়ত একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সায়েব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড্ করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার উপক্রম! আনন্দের আতিশয্যে নূতন গেঞ্জির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু' তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড্ হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে। পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, না শুধু চোখ বন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিমশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ—যোগরূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর—ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি। উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে।'

পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাট সায়েবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে!'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাশী নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

বললেন, 'হল না। আর কে ছিল?' বললুম 'ঐ যে বললুম, এক গাদা এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেননি।'

পণ্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরো গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা না তোর মত অলম্বুষ?'

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই; জিজ্ঞেস করুন না পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে!'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ,—রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে—'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ওতো এক সেকেণ্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো!'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম, 'আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল!'

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরীতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার

নৌকোর মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে অনেক সেলাম টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা; লাট সায়েবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।'

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকোয় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট দিতেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মত কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সায়েবের কুকুরটার একট ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে-খবরটাও বেশ গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আটজনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মদনমোহন কি রকম আঁক শেখায় রে?'

মদনমোহনবাবু আমাদের অঙ্কের মাস্টার—পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'বেশ বেশ। তবে শোন। মিম্বর উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচা হয়। এইবার দেখি, তুই কি রকম আঁক শিখেছিস। বল তো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?'

আমি ভয় করেছিলুম পণ্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।' পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাধু, সাধু!'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবনধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের ক'টা ঠ্যাঙের সমান?'

আমি হতবাক্।

'বল না।'

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

মূর্খের মত একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পণ্ডিতমশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরন্ময়' 'Silence is golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই।

॥ বেঁচে থাকো সর্দি কাশি ॥

ভয়ঙ্কর সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে যা জল বেরচ্ছে তা সামলানো রুমালের কর্ম নয়। ডবল সাইজ বিছানার চাদর নিয়ে আগুনের কাছে বসেছি। হাঁচছি আর নাক ঝাড়ছি, নাক ঝাড়ছি আর হাঁচছি। বিছানার চাদরের অর্ধেকখানা হয়ে এসেছে, এখন বেছে বেছে শুকনো জায়গা বের করতে হচ্ছে। শীতের দেশ, দোর জানালা বন্ধ, কিচ্ছু খোলার উপায় নেই। জানালা খুললে মনে হয় গৌরীশঙ্করের চূড়োটি যেন হিমালয় ত্যাগ করে আমার ঘরে নাক গলাবার তালে আছেন।

জানি, একই রুমালে বারবার নাক ঝাড়লে সর্দি বেড়েই চলে, কিন্তু উপায় কি? দেশে হলে রকে বসে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়তুম, এ নোংরামির হাত থেকে রক্ষা তো পেতুমই, নাকটাও কাপড়ের ঘষায় ছড়ে যেত না।

হঠাৎ মনে পড়ল পরশু দিন এক ডাক্তারের সঙ্গে অপেরাতে আলাপ হয়েছে। ডাকসাঁইটে ডাক্তার—ম্যুনিক শহরে নাম করতে পারাটা চাট্টিখানা কথা নয়। যদিও জানি ডাক্তার করবে কচু, কারণ জর্মন ভাষাতেই প্রবাদ আছে, 'ওষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, না খেলে এক সপ্তায়'।

তবু গেলুম তাঁর বাড়ি। আমার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি। আমি শুধালুম, 'সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার।'

ডাক্তার যদিও জর্মন তবু হাত ছ'খানি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন ফরাসিস্ কায়দায়। বললেন, 'অবাক করলেন, স্যর! সর্দির ওষুধ নেই? কত চান? সর্দির ওষুধ হয় হাজারো রকমের।'

বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুললেন লাল কেল্লার সদর দরজা পরিমাণ এক আলমারি। চৌকো, গোল, কোমর-মোটা, পেট-ভারী বাহান্ন রকমের বোতল-শিশিতে ভর্তি। নানা রঙের লেবেল আর সেগুলোর উপর লেখা রয়েছে বিকট বিকট সব লাতিন নাম।

এবারে খানদানী ভিয়েনীজ কায়দায় কোমরে ছ'ভাঁজ হয়ে বাও করে বাঁহাত পেটের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় দেরাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি দেখিয়ে বললেন, 'বেছে নিন, মহারাজ (কথাটা জর্মন ভাষায় চালু আছে); সব সর্দির দাওয়াই।'

আমি সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকালুম। ডাক্তার মুখব্যাদান করে পরিতোষের ঈষৎ হাস্য দিয়ে গালের ছুটি টোল খোলতাই করে দিয়েছেন—হা টা লেগে গিয়েছে ছ'কানের ডগায়।

একটা ওষুধের কটমটে লাতিন নাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বললুম, 'এর মানে তো জানিনে।'

সদয় হাসি হেসে বললেন, 'আমিও জানিনে, তবে এটুকু জানি, ঠাকুরমা মার্কা কচু-ঘেঁচু মেশানো দিশী দাওয়াই মাত্রেরই লম্বা লম্বা লাতিন নাম হয়?'

আমি শুধালুম, 'খেলে সর্দি সারে?'

বললেন, 'গলায় একটু আরাম বোধ হয়, নাকের সুড়সুড়িটা হয়ত একটু-আধটু কমে। আমি কখনো পরখ করে দেখিনি। সব পেটেন্ট ওষুধ—নমুনা হিসাবে বিন পয়সায় পাওয়া। তবে সর্দি সারে না, এ কথা জানি।'

আমি শুধালুম, 'তবে যে বললেন সর্দির ওষুধ আছে?'

বললেন, 'এখনো বলছি আছে কিন্তু সর্দি সারে সে কথা তো বলিনি।'

বুঝলুম, জর্মনি কান্ট হেগেলের দেশ। বললুম, 'অ।'

ফিসফিস করে ডাক্তার বললেন, 'আরেকটা তত্ত্বকথা এই বেলা শিখে নিন। যে ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন, সে ব্যামো ওষুধে সারে না।'

ততক্ষণে আবার আমি হাঁচ্ছো হাঁচ্ছো আরম্ভ করে দিয়েছি। নাকচোখ দিয়ে এবার রাইন-ওডার না, এবারে পদ্মা-মেঘনা। ডাক্তার ডজন দুই কাগজের রুমাল আর একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ধাক্কাটা সামলে উঠে প্রাণভরে জর্মন সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম।

দেখি, ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন।

আমার মুখে হয়ত একটু বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। বললেন, 'সর্দি-কাশির গুণও আছে।'

আমি বললুম, 'কচু, হাতী, ঘণ্টা!'

বললেন, 'তর্জমা করে বলুন।'

আমি বললুম, 'কচুর' লাতিন নাম জানিনে; 'হাতী' হল এলেফাণ্ট' আর 'ঘণ্টা' মানে 'গ্লকে'।'

'মানে?'

'আর বুঝে দরকার নেই; এগুলো কটুবাক্য।'

আকাশ পানে হানি যুগলভুরু বললেন, 'অদ্ভুত ভাষা! হাতী আর ঘণ্টা গালাগালি হয় কি করে! একটা গল্প শুনবেন? সঙ্গে গরম ব্রাণ্ডি?'

আমি বললুম, 'প্রথমটাই চলুক। মিক্স্ করা ভালো নয়।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি ডাক্তারি শিখেছি বার্লিনে। বছর

তিনেক প্র্যাকটিস করার পর একদিন গিয়েছি স্টেশনে, বন্ধুকে বিদেয় দিতে। ফেরার সময় স্টেশন-রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি একটা ব্রাণ্ডি খাব বলে।

'ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। দেখি, এক কোণে এক অপরূপ সুন্দরী। অত্যন্ত সাদাসিদে বেশভূষা,—গরীব বললেও চলে—আর তাই বোধ হয় সৌন্দর্যটা পেয়েছে তার চরম খোলতাই। নর্থ সী দেখেছেন? তবে বুঝতেন হব-হব সন্ধ্যায় তার জল কি রকম নীল হয়—তারই মত সুন্দরীর চোখ। দক্ষিণ ইটালীতে কখনো গিয়েছেন? না? তবে বুঝতেন সেখানে সোনালী রোদে রূপালী প্রজাপতির কি রাগিণী। তারই মত তাঁর ব্লণ্ড চুল। ডানয়ুব নদী দেখেছেন? না? তা হলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা।'

আমি বললুম, 'বলে যান, রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।'

'না, থাক। ওরকম বেয়ারিং পোস্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না। আমরা ডাক্তার-বদ্যি মানুষ, ভাষা বাবদে মুখ্য-সুখ্যু। অনেক মেহন্নত করে যে একটি মাত্র বর্ণনা কব্জায় এনেছি সেইটেও যদি না বোঝেন তবে আমার শোকটা কোথায় রাখি বলুন তো?'

কাতর হয়ে বললুম 'নিরাশ করবেন না।'

'তবে চলুক ত্রিলেগেড্ রেস। ডানয়ুব নদীর শান্ত-প্রশান্ত ভাবখানা তাঁর মুখের উপর। অথচ জানেন, ডানয়ুব অগভীর নদী নয়। আর ডানয়ুবের উৎপত্তিস্থল দেখেছেন? না? তাহলে বুঝতেন সেখানে তন্বঙ্গী ডানয়ুব যে রকম লাজুক মেয়ের মত এঁকে বেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত, এ-মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকুবাঁকু ভাব।

'এই লজ্জা ভাবটার উপরই আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লজ্জা-শরম বলতে আমরা যা কিছু

বুঝি সে সব মধ্যযুগের পুরনো গল্প থেকে। বেয়াত্রিচে দান্তেকে দেখে লাজুক হাসি হেসেছিলেন—আমরা তাই নিয়ে কল্পনার জাল বুনি, আজকের দিনে এসব তো আর বার্লিন শহরে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের নাইটদের শিভালরি গেছে আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে মেয়েদের মুখ থেকে সব লজ্জা সব ব্রীড়া।

'কিন্তু আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই এখনো এই মধুর জিনিসটি দেখতে পাওয়া যায়, আর তার চেয়েও নিশ্চয়, আপনাদের দেশের লোক এখনো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে।

'তাই আপনি বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আমি নিজে এখনো ঠিক করতে পারিনি, কি করে আমার তখন মনে হল, এ-মেয়েকে না পেলে আমার চলবে না।

'হাসলেন না যে? তার থেকেই বুঝলুম, আপনি ওকীবহাল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন; কিন্তু জর্মনরা আমার এ-অবস্থার কথা শুনে হাসে। আর হাসবেই বা না কেন? চেনা নেই, শোনা নেই, বিত্তাবুদ্ধিতে মেয়েটা হয়ত অফিসবয়ের চেয়েও আকাট, হয়ত মাতালদের আড্ডায় বিয়ার বিক্রি করে পয়সা কামায়, কিম্বা এও তো হতে পারে যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এ-সব কোনো কিছুর তত্ত্ব-তাবাশ না করে এক ঝটকায় মনস্থির করে ফেলা, এ-মেয়ে না হলে আমার চলবে না! আমি কি খামখেয়ালির চেঙ্গিসখান, না হাজারো প্রেমের ডন্ জুয়ান্?

'ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়ছি—কোন্ অজুহাতে কোন্ অছিলায় এঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

'কিছুতেই কোনো হদীস পাচ্ছিনে, আমাদের মাঝখানে তিনখানা মাত্র ছোট্ট টেবিলের যে উত্তাল সমুদ্র সেটা পেরিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছই কি প্রকারে। প্রবাদ আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি

বুদ্ধিমান হয়ে যায়—প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তখন তার ফন্দি-ফিকির আর আবিষ্কার কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায় আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম গবেট—এমন সব কাণ্ড তখন করে বসে যে দশজন তাজ্জব না মেনে যায় না, এ লোকটা এ-সব পাগলামি করছে কি করে!

'এ জীবনে সেই সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে আমি বুদ্ধিমান, কারণ পূর্ণ একঘণ্টা ধরে ভেবেও আমি সামান্যতম কৌশল আবিষ্কার করতে পারলুম না, আলাপ করি কোন্ কায়দায়। কিন্তু এহেন হৃদয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না। তখন বরঞ্চ বোকা বনতে পারলেই হয়ত কোনো একটা কৌশল বেরিয়ে যেত।

'ফ্রলাইন উঠে দাঁড়ালেন। কি আর করি। পিছু নিলুম। তিনি গিয়ে উঠলেন ম্যুনিকের গাড়িতে। আমিও ছুটে গিয়ে টিকিট কাটলুম ম্যুনিকের। কিন্তু এসে দেখি সে কামরার আটটা সীটই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আরো প্রমাণ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধিমান, কারণ এ কথা সবাই জানে, বুদ্ধিমানকে ভগবান সাহায্য করলে এ-পৃথিবীতে বোকাদের আর বাঁচতে হত না! আমি ভগবানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলুম না।'

আমি বললুম, 'ভগবানকে দোষ দিচ্ছেন কেন? এ তো কন্দর্প ঠাকুরের ডিপার্টমেণ্ট।'

বললেন, 'তাতেই বা কি লাভ? তিনি তো অন্ধ। মেয়েটাকে বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরই মত অন্ধ। এই যে আমি একটা এত বড় অ্যাপলো, আমার দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকালো না। ওঁকে ডেকে হবে—'

আমি বললুম, 'কচু, হাতী, ঘণ্টা।'

এবার ডাক্তার বাঙলা কটুকাটব্যের কদর বুঝলেন। বললেন,

'আহা-হা-হা।' তারপর জর্মন উচ্চারণে বললেন, 'কশু, হাটী, গণ্টা! খাসা গালাগাল।'

আমি বললুম, 'কামরাতে আটজনের সীট ছিল তো বয়েই গেল। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি কোনো গতিকে ধাক্কাধাক্কি করে—'

বললেন, 'তাজ্জব করলেন। একি আপনার ইণ্ডিয়ান ট্রেন, না সাইবেরিয়াগামী প্রিজনার-ভ্যান! চেকার পত্রপাঠ কামরা থেকে বের করে দেবে না?

'দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের করিডরে ঠায়। দেখি, মেয়েটি যদি খানা-কামরায় যায়। স্টেশনে তো খেয়েছে শুধু কফি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলো, কত লোক কত কামরা থেকে উঠলো নামলো কিন্তু আমার স্বর্গপুরী থেকে কোনো—(কটুবাক্য) নামলো না। সব ব্যাটা নিশ্চয়ই যাচ্ছে ম্যুনিক। আর কোথাও যেতে পারে না? ম্যুনিক কি পরীস্থান না ম্যুনিকের ফুট-পাথ সোনা দিয়ে গড়া? অবাক করলে এই ইডিয়টগুলো।

'প্রেমে পড়লে নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। একবেলার জন্য হয়ত পায়। আমি লাঞ্চ খাইনি, ওদিকে ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে—আমার পেটের ভিতর হুলুধ্বনি জেগে উঠেছে। এমন সময় মা-মেরীর করুণা হল। মেয়েটি চলল খানা-কামরার দিকে। আমিও চললুম ঠিক পিছনে পিছনে। আহা, যদি একটা হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে যায়। ছুত্তোর তারও উপায় নেই—উঁচু হিলের জুতো হলে গাড়ির কাঁপুনিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—এ পরেছে ক্রেপ-সোল্।

'ঠিক পিছনে পিছনে গিয়ে খানা-কামরায় ঢুকলুম। ওয়েটারটা ভাবলে স্বামী-স্ত্রী। না হলে তরুণ-তরুণী মুখ গুমসো করে খানা-কামরায় ঢুকবে কেন? বসালো নিয়ে একই টেবিলে—মুখোমুখি। হে মা-মেরী, নত্রদাম্ গির্জেয় তোমার জন্য আমি একশ'টা

মোমবাতি মানত করলুম। দয়া করো, মা, একটা কিছু ফিকির বাংলাও আলাপ করবার।

'বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কোনো সন্দেহ নেই আমি বুদ্ধিমান। কোনো ফিকিরই জুটলো না, অথচ মেয়েটি বসে আছে আমার থেকে দু'হাত দূরে এবং মুখোমুখি। দু'হাত না হয়ে দু'লক্ষ যোজনও হতে পারত—কোনো ফারাক হ'ত না।

'জানালা দিয়ে এক ঝটকা কয়লার গুঁড়া এসে টেবিলের উপর পড়ল। মেয়েটি ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতেই আমি ঝটিতি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে করে ফেললুম আরেক কাণ্ড। ঠাস করে জানালাটা বুড়ো আঙুলের উপর পড়ে সেটাকে দিল থেঁতলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত।

'মা-মেরীর অসীম দয়া কাণ্ডটা যে ঘটলো। মেয়েটি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'দাঁড়ান, আমি ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসছি।'

'আমি নিজে ডাক্তার, বিবেচনা করুন অবস্থাটা। রুমাল দিয়ে চেপে ধরলুম আঙুলটাকে। মেয়েটি ছুটে নিয়ে এল কামরা থেকে ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ। তারপর আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্র-সম্মত ডাক্তারি পদ্ধতিতে। বুঝলুম মেডিকেল কলেজে পড়ে। ঝানু ডাক্তার ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ বয়ে বেড়ায় না আর আনাড়ী লোক এরকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারে না।

'আমি তো, 'না, না' 'আপনি কেন মিছে মিছে,' 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,' 'উঃ, বড্ড লাগছে,' 'এতেই হবে,' 'ব্যস্ ব্যস্' করেই যাচ্ছি আর সেই লিলির মত সাদা হাতের পরশ পাচ্ছি। সে কি রকম মখমলের হাত জানেন? বলছি; আপনি কখনো রাইনল্যাণ্ড গিয়েছেন? না? থাক, ভুলেই গিয়েছিলুম, প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনাকে কোনো বর্ণনা দেব না।

'প্রথম পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়, বলে না? বড় খাঁটি

কথা। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার হাতে কোনো প্রকারের স্পর্শ-কাতরতা থাকার কথা নয় তবু আমার যে কী অবস্থাটা হয়েছিল আপনাকে সেটা বোঝাই কি করে? মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল, কারণ একবার চকিতের তরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।

'তাতে ছিল বিস্ময়, প্রশ্ন এবং হয়ত বা একটুখানি অতি সামান্য খুশীর ঝিলিমিলি। তবে কি আমার হাতের স্পর্শ—? কোন্ সাহসে এ-বিশ্বাস মনের কোণে ঠাঁই দিই বলুন।'

আমি গুন্ গুন্ করে বললুম,

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে'।'

ডাক্তার বললেন, 'খাসা মেলডি তো। মানেটাও বলুন।'

বললুম, 'আফ্‌টার ইউ। আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

বললেন, 'গল্প নয়, স্যর; জীবনমরণের কথা হচ্ছে।'

আমি শুধালুম, 'কেন, সেপ্টিকের ভয় ছিল নাকি?'

রাগের ভাব করে বললেন, 'ইয়োরোপে এসে আপনার কি সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে? আমাকে হেনেছে প্রেমের বাণ আর আপনি বলছেন অ্যান্টি-সেপ্টিক্ আন।'

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না।'

বললেন, 'তার পর আমি সুযোগ পেয়ে আরম্ভ করলুম নানা রকমের কথা কইতে। গোল গোল। আমি যে পরিচয় করার জন্য জান-কবুল সেটা ঢেকে চেপে। সঙ্গে সঙ্গে কখনো নুনটা এগিয়ে দি, কখনো ক্রুয়েটটা সরিয়ে নি, কখনো বা বলি, 'মাছটা খাসা ভেজেছে, আপনি একটা খান না; ওহে খানসামা, এদিকে—ইত্যাদি।

'করে করে সুন্দরীর মনটা একটু মোলায়েম করতে পেরেছি বলে মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।

'মেয়েটি লাজুক বটে কিন্তু ভারী ভদ্র। আমার ভ্যাজর ভ্যাজর কান পেতে শুনলো, ছ'একবার ব্লাশ্ করলো, সে যা গোলাপি—আপনি কখনো, না, থাক।

'কিন্তু খেল মাত্র একটি অমলেট আর ছ'স্লাইস রুটি। নিশ্চয়ই গরীব। ক্ষীণ আশাটার গায়ে একটু গত্তি লাগল।' এমন সময় ডাক্তারের অ্যাসিস্টাণ্ট এসে জানালো রুগী এসেছে। ডাক্তার বললেন, 'এখখুনি আসছি।'

ফিরে এসে কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'ম্যুনিকে নাবলুম এক বস্ত্রে। এমন ভাণ করে কেটে পড়লুম যাতে মেয়েটি মনে করে আমি ভ্যান থেকে মাল নামাতে গেলুম। যখন 'গুড্ বাই' বলে হাত বাড়ালুম তখন সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। প্রেমে পড়লে নাকি মানুষের পাখা গজায়—হবেও বা, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি মানুষ তখন চোখে মুখে এমন সব নূতন ভাষা পড়তে পারে যার জন্য কোনো শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হয় না। তবে সে পড়াতে ভুল থাকে বিস্তর, কাকতালীয় এন্তার।

'আমি দেখলুম, লেখা রয়েছে 'বিষাদ' কিন্তু পড়লুম, 'এই কি শেষ'?'

আমিও অবাক হয়ে শুধালুম, 'বার্লিন থেকে ম্যুনিক অবধি হামলা করে স্টেশনে খেই ছেড়ে দিলেন?'

ডাক্তারদের বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আদপেই না। কিন্তু কি আর দরকার পিছু নিয়ে? মেডিকেল কলেজে পড়ে, ওতেই ব্যস্।

'সেদিনই গেলুম মেডিকেল কলেজের রেস্তোরাঁয়। লাঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই আসবে। এবারে মেয়েটি আর লজ্জা দিয়ে মনের ভাব ঢাকতে পারল না। আমাকে দেখা মাত্র আপন অজানাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে যে খুশী ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না,

ভগবান মাঝে মাঝে বুদ্ধিমানকেও সাহায্য করেন।

'ততক্ষণে মেয়েটি তার আপন-হারা আচরণটাকে সামলে নিয়েছে—লজ্জা এসে আবার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে।'

ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানেই যদি শেষ করা যেত তবে মন্দ হত না কিন্তু সর্দি-কাশির তো তা হলে কোনো হিল্লে হয় না। তাই কমিয়ে-সমিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দি।'

আমি বল্‌লুম, 'কমাবেন না। তালটা একটু দ্রুত করে দিন। আমাদের দেশের ওস্তাদরা প্রথম খানিকটে গান করেন বিলম্বিত একতালে, শেষ করেন দ্রুত তেতালে।'

ডাক্তার বললেন, 'দুঃখিনী মেয়ে' বাপ-মা নেই। এক খাণ্ডার পিসির বাড়িতে মানুষ হয়েছে। দু'মুঠো খেতে দেয় পরতে দেয়, ব্যস্‌। কলেজের ফীজটি পর্যন্ত বেচারী যোগাড় করে মাস্টারী করে।

'তাতে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি এভাকে বুড়ী এমনি নজরবন্দ করে রেখেছে যে, চকিতা হরিণীর মত সমস্তক্ষণ সে শুধু ডাইনে বাঁয়ে তাকায়, ঐ বুঝি পিসি দেখে ফেললে, সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইছে। আমি তো বিদ্রোহ করে বললুম, 'একি বুখারার হারেম, না তুর্কী পাশার জেনানা? এ অত্যাচার আমি কিছুতেই সইব না।' এভা শুধু আমার হাত ধরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ, তুমি একটু বরদাস্ত করে নাও; আমি তোমাকে হারাতে চাইনে।' এর বেশী সে কক্‌খনো কিছু বলেনি।

'এই মোকামে পৌঁছতে আমার লেগেছিল ঝাড়া একটি মাস। বিবেচনা করুন। সাত দিন লেগেছিল প্রেম নিবেদন করতে। পনরো দিন লেগেছিল হাতখানি ছুঁতে। তারো এক সপ্তাহ পরে সে আমায় বললে কেন সে এমন ভয়ে ভয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়।

'থিয়েটার সিনেমা মাথায় থাকুন, আমার সঙ্গে রাস্তায় পর্যন্ত

বেরতে রাজী হয় না—পাছে পিসি দেখে ফেলে। আমি একদিন থাকতে না পেরে বললুম, 'তোমার পিসির কি কুইনটুপ্লেট আছে নাকি যে তারা ম্যুনিকের সব স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তোমার উপর নজর রাখছে?' উত্তরে শুধু কাতর স্বরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ।'

'যা-কিছু আলাপ পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা-আত্মীয়তা সব ঐ কলেজ-রেস্তোরাঁয় বসে। সেখানে ভিড় সার্ডিন-টিনের ভিতর মাছের মত। চেয়ারে চেয়ারে ঠাসাঠাসি কিন্তু তার হাতে যে হাতখানা রাখব তারও উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে।'

আমি বললুম,

'সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।'

ডাক্তার বললেন, 'মানে বলুন।'

আমি বললুম, 'আপ যাইয়ে, পরে বলবো।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই ভিড়ের মাঝখানে, কিম্বা করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপচারি। করিডরে কথা কওয়া যায় প্রাণ খুলে, কিন্তু তবু আমি রেস্তোরাঁর ভিড়ই পছন্দ করতুম বেশী, কারণ সেখানে দৈবাৎ, ক্বচিৎ কখনো এভা তার ছোট্ট জুতোটি দিয়ে আমার পায়ের উপর দিত চাপ।

'তার মাধুর্য আপনাকে কি করে বোঝাই? এভাকে পরে নিবিড়তর করে চিনেছি কিন্তু সেই পায়ের চাপ যে আমাকে কত কথা বলেছে, কত আশ্বাস দিয়েছে সেটা কি করে বোঝাই?

'হয়ত তার চেনা কোনো এক ছোকরা স্টুডেন্ট এসে হাসিমুখে তাকে দুটি কথা বললে। অত্যন্ত হার্মলেস্, আমি কিন্তু হিংসেয় জরজর। টেবিলের উপর রাখা আমার হাত দুটো কাঁপতে আরম্ভ করছে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে—

'এমন সময় সেই পায়ের মৃদু চাপ।

'সব সংশয়ের অবসান, সব দুঃখ অন্তর্ধান।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই আমার দুঃখ আর বেদনার অবধি রইল না। এই বিরাট ম্যুনিক শহরে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিভৃতে মনের ভার নামাচ্ছে, নিষ্ঠুর সংসারে লড়বার শক্তি একে অন্যের সঙ্গসুখ স্পর্শসুখ থেকে আহরণ করে নিচ্ছে, আর আমি তারই মাঝখানে এমন কিছুই করে উঠতে পারছিনে যাতে করে এভাকে অন্তত একবারের মত কাছে টেনে আনতে পারি।

'শেষটায় আর সইতে না পেরে একদিন এভাকে কিছু না বলে ফিরে গেলুম বার্লিন। সেখান থেকে লিখে জানালুম, 'ও রকম কাছে থেকে না পাওয়ার দুঃখ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আমার নার্ভস্ একদম গেছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা আমার কিছুতেই হয়ে উঠত না—তোমার মুখের কাতর ছবি আমার চলে আসার সব শক্তি নষ্ট করে ফেল্‌ত'।'

আমি বললুম, 'আপনি তো দারুণ লোক, মশাই। তবে, হ্যাঁ, আপনাদের নীটশেই বলেছেন, কড়া না হলে প্রেম মেলে না'।'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক উল্টো। কড়া হতে পারলে আমি ম্যুনিক থেকে পালাতুম না। পলায়ন জিনিসটা কি বীরের লক্ষণ? তা সে কথা থাক।

'উত্তর পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই। সে চিঠিটি আমি এতবার পড়েছি যে তার ফুলস্টপ, কমা পর্যন্ত আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সে চিঠিটির বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকলো।

'আপনাদের দেশে অবিশ্বাস্য বলে কোনো জিনিস নেই—ভিখিরিকে মাথায় তুলে নিয়ে আপনাদের দেশে হাতী হামেশাই রাজা বানায়। কিন্তু জর্মনিতে তো সে রকম ঐতিহ্য নেই।

চিঠিতে লেখা ছিল :—

'বেশী লিখব না—আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থির করেছি, তোমার ইচ্ছামত তোমায় আমায় একবার নিভৃতে দেখা হবে। তার পর বিদায়। যত দিন পিসি আছেন ততদিন আমি আর কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আসছে বুধবার দিন আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাতে অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসব।'

ডাক্তার বললেন, 'বিশ্বাস হয় আপনার? যে মেয়ে পিসির ভয়ে আমার সঙ্গে কলেজ রেস্তোরাঁর বাইরে পর্যন্ত যেতে রাজী হত না, সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আপন ঘরে?'

আমি বললুম, 'পীরিতি-সায়রে ডোবার পূর্বে যে রাধা সাপের ছবিমাত্র দেখেই অজ্ঞান হতেন সেই রাধাই অভিসারে যাওয়ার সময় আপন হাত দিয়ে পথের পাশের সাপের ফণা চেপে ধরেছেন পাছে সাপের মাথার মণির আলোকে কেউ তাঁকে দেখে ফেলে।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই বটে। তবে কি না আমি রাধার প্রেমকাহিনী কখনো পড়িনি। সে কথা থাক।

'আমি ম্যুনিক পৌঁছলুম, বুধবার দিন সন্ধ্যের দিকে। কয়লার গুঁড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল বলে ঢুকলুম একটা পাবলিক বাথে স্নান করতে। টাবে বসে সর্বশরীর ডলাই-মলাই করে আর গরম জলে সেদ্ধ হয়ে চিংড়িটার মত লাল হয়ে যখন বেরলুম তখন আর হাতে বেশী সময় নেই। অথচ টাব থেকে ও রকম হুট করে ঠাণ্ডায় বেরলে যে সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে সর্দি হয় সে কথাও জানি। চানটা না করলেও যে হত সে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু তখন আর আফসোস করে কোনো ফায়দা নেই। সেই ডিসেম্বরের শীতে চললুম এভার বাড়ির দিকে—মা-মেরীর উপর ভরসা করে, যে এ যাত্রায় সর্দিটা নাও হতে পারে।'

আমি বললুম, 'আমরা বাঙলায় বলি, 'তুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লুম।'

ডাক্তার বললেন, সাড়ে এগারোটার সময় গিয়ে দাঁড়ালুম এভার বাড়ির সামনের রাস্তায়। টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নীচে—আপনাদের পাগলা ফারন্‌হাইটের হিসেবে বত্রিশের ঢের নীচে। রাস্তায় এক ফুট বরফ! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর আমার চতুর্দিকে যে হিম ঘনাতে লাগলো তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে পারি আমাকে যেন কেউ একটা বিরাট ফ্রিজিডেরের ভিতর তালাবন্ধ করে রেখে দিল।

'তিন মিনিট যেতে না যেতে নামল মুষলধারে—বৃষ্টি নয়—সর্দি। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনামাইট ফাটার হাঁচি—হাঁচ্চো, হাঁচ্চো, হাঁচ্চো। আপনার আজকের সর্দি তার তুলনায় নস্যি, অর্থাৎ নস্যির খোঁচায় নামানো আড়াই ফোঁটা জল। হাঁচি আর জল, জল আর হাঁচি।

'কি করি, কি করি ভাবছি, এমন সময় এভা এসে নিঃশব্দে আমার হাত ধরলো—বরফের গুঁড়োর উপর পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তার উপর সে পরেছে সেই ক্রেপ-সোলের জুতো—বেচারীর মাত্র ঐ এক জোড়াই সম্বল।

'কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে, করিডরের খানিকটে পেরিয়েই তার কামরা। নিঃশব্দে আমাকে সে ঢুকিয়ে দরজায় খিল দিয়ে মাথা নিচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

'এভার গোলাপি মুখ ডাচ্ পনিরের মত হলদে, টুকটুকে লাল ঠোঁটদুটি ব্লু ডানয়ুবের মত ঘন বেগুনি-নীল—ভয়ে, উত্তেজনায়।

'আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আবার আমার সেই ডাইনামাইট ফাটানো হাঁচ্চো, হাঁচ্চো।

'এভা আমাকে ধরে নিয়ে আমার মাথা গুঁজে দিল বিছানায়।

মাথার উপর চাপালো বালিশ আর সব ক'খানা লেপ-কম্বল। বুঝতে পারলুম কেন, পাশের ঘরে পিসি যদি শুনতে পান তবেই হয়েছে। আমি প্রাণপণ হাঁচি চাপবার চেষ্টা করছি আর লেপ-কম্বলের ভিতর বম্-শেল্ ফাটাচ্ছি।

'কতক্ষণ এ রকম কেটেছিল বলতে পারব না। হাঁচির শব্দ কিছুতেই থামছে না। এভা শুধু কম্বল চাপাচ্ছে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম কিন্তু নিবিড় পুলকে বার বার আমার সর্বশরীর শিহরিত হচ্ছে—এভার হাতের চাপ পেয়ে।

'এমন সময় দরজায় ধাক্কা আর নারীকণ্ঠের তীব্র চীৎকার, 'দরজা খোল'।

'পিসি!

'আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি লেপের ভিতর থেকে বেরলুম। এভা ভয়ে ভিরমি গিয়েছে, খাটের উপর নেতিয়ে পড়েছে।

'আমি দরজা খুলে দিলুম। সাক্ষাৎ শকুনির মত বীভৎস এক বুড়ী ঘরে ঢুকে আমার দিকে না তাকিয়েই এভাকে বললো, 'কাল সকালেই তুই এ-বাড়ি ছাড়বি'।

'সঙ্গে সঙ্গে আর কি সব বকুনি দিয়েছিল, 'ঘেন্না,' 'কেলেঙ্কারি,' 'শোবার ঘরে পরপুরুষ,' 'রাস্তার মেয়ের ব্যাভার,' এই সব, সে আমার আর মনে নেই। বুড়ী আমার দিকে তাকায় না, গালের উপর গাল চড়ছে যেন ছ'গজী পিয়ানোর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি কেউ আঙুল চালাচ্ছে।

'আমি আর থাকতে পারলুম না। বুড়ীর দুই বাহু দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে বললুম, 'আমার নাম পেটার সেল্‌বাখ্। বার্লিনে ডাক্তারি করি। ভদ্রঘরের ছেলে। আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই'।'

ডাক্তার বললেন, 'মা-মেরী সাক্ষী, আমি এভাকে বিয়ে করার প্রস্তাব এতদিন করিনি পাছে সে 'না' বলে বসে। আমি অপেক্ষা করছিলুম পরিচয়টা ঘনাবার জন্য। বিয়ের প্রস্তাবটা আমার মুখ দিয়ে যে তখন কি করে বেরিয়ে গেল আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

'পিসি আমার দিকে হাবার মত তাকালো—এক বিঘত চওড়া হাঁ করে। পাকা দু'মিনিট তার লেগেছিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর ফুটে উঠল মুখের উপর খুশীর পয়লা ঝলক। সেটা দেখতে আরো বীভৎস! মুখের কুঁচকানো, এবড়ো-খেবড়ো গাল, ভাঙা-চোরা নাক-মুখ-ঠোঁট যেন আরো বিকৃত হয়ে গেল।

'আমাকে জড়িয়ে ধরে কি যেন বললে ঠিক বুঝতে পারলুম না। তারপর হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল করিডরের দিকে। চীৎকার করে কাকে যেন ডাকছে।

'এভা তখনো অচৈতন্য?

'বুড়ী ফিরে এল বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে। তার চেহারার খুশীর পিছনে দেখলুম সেই ভীত ভাব—এভার মুখে যেটা অষ্টপ্রহর লেপা থাকে। বুঝলুম, পিসির দাপটে এ বাড়ির সকলেরই কণ্ঠশ্বাস।

'মনে হল বুড়ো খুশী হয়েছে এভা যে এ বাড়ির অত্যাচার থেকে নিষ্কৃত পেয়েছে তার জন্য। হায়, তার তো নিষ্কৃতি নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই দুপুর রাতে ওয়াইন এল, শ্যাম্পেন এল। হোটেল্ থেকে সসেজ্ কট্‌লেট্ এল। হৈহৈ রৈরৈ। এভা সম্বিতে ফিরেছে। বুড়ো শ্যাম্পেন টানছে জলের মত। বুড়ী এক গেলাসেই টং। আমাকে জড়িয়ে শুধু কাঁদে আর এভার বাপের কথা স্মরণ করে বলে, ভাই বেঁচে থাকলে আজ সে কী খুশীটাই না হ'ত।

'আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে কানে বলল, 'জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো'।'

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন এক সুন্দরী—হ্যাঁ, সুন্দরী বটে।

এক লহমায় আমি নর্থ সীর ঘন নীল জল, দক্ষিণ ইটালীর সোনালী রোদে রূপালী প্রজাপতি, ডানয়ুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি, সেই ডানয়ুবেরই লজ্জাশীল দেহচ্ছন্দ, রাইনল্যাণ্ডের শ্যামালিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সব কিছুই দেখতে পেলুম।

আর সে কি লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

আমি মাথা নিচু করে ফরাসিস কায়দায় তাঁর চম্পক করাঙ্গুলি-প্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে মনে বললুম,

'বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি
চিরজীবী হয়ে তুমি।'

॥ মণি ॥

'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি-গুরু বাল্মীকির বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন, তিনি তাঁর কাব্যে উর্মিলার প্রতি অবিচার করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন, রসসৃষ্টিতে তাবৎ নায়ক-নায়িকাকে সমান সম্মান অধিকার দেওয়া সম্ভবপর নয়।

তবু তো উর্মিলার উল্লেখ রামায়ণে আছে। কিন্তু রামচন্দ্র আর সীতাদেবীর কি আরও বহু অনুচর সখা বান্ধবী পরিচারিকা ছিলেন না, যাদের উল্লেখ আদিকবি আদপেই করেননি? তাঁদের জীবনে সুখ-দুঃখ উৎসব-ব্যসন বিরহ-বেদনা মিলনানন্দ সব-কিছুই ছিল। এতদসত্ত্বেও আদিকবি তাঁদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। তিনি তো কিছু নিছক কাল্পনিক চরিত্রসৃষ্টি করেননি, 'নির্ভেজাল' রূপকথাতে যে-রকম হয়। তিনি তো লিখেছিলেন ইতিহাস, অবশ্য রসের গামলায় চুবিয়ে নিয়ে, বাটিক প্রক্রিয়ায়। হলই বা। তাই বলে কি শেষ-মেশ ওইসব অভাগাদের জ্যান্ত পোঁতা হল না?

জানিনে, আদিকবিকে এ-ফরিয়াদ জানালে তিনি কি উত্তর দিতেন। যে চন্দ্রবৈদ্য শ্রীরামচন্দ্রের নখ-চুল কেটে দিত, যে শুক্র-বৈদ্য মা-জননী জনকতনয়ার দুকুল-কাঁচুলি কেচে দিত তারা যদি কবিসমীপে নিবেদন করত, তাদেরই বা তিনি ভুলে গেলেন কেন? উর্মিলার মত নিদেন তাদের নামোল্লেখ করলেই তো তারা অজরা-মর হয়ে যেত, তবে তিনি কি উত্তর দিতেন?

অত দূরে যাই কেন? কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথকে যদি জিজ্ঞেস করা হত, বিনয় এবং ললিতার মত দুটি অত্যুত্তম চরিত্রসৃষ্টি করার

পর—হায়, বাংলায় সচ্চরিত্র কী দুর্লভ—তিনি সে-দুজনকে পথমধ্যে গুমখুন করলেন কেন, তা হলে তিনি কী উত্তর দিতেন ?

আমি বাল্মীকি নই, রবীন্দ্রনাথও নই। এমন কি আমার আপন গ্রামের প্রধান লেখক নই। আমার গ্রামের শুকুরুল্লা এবং পাগলা মাধাই যে-সব ভাটিয়ালি রচে গিয়েছে, আমার রচনা তাদের সামনে লজ্জায় ঘোমটা টানে। মাধাইয়ের একটি ভাটিয়ালির ভুলে-যাওয়া অন্তরা আমি তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও পূরণ করতে পারিনি। মাধাই ও আমি একই পাঠশালাতে একই শ্রেণীতে পড়েছি। মাধাই ফি বচ্ছর ফেল মারত, আমি ফার্স্ট হতুম।

তাই, বিশেষ করে তাই, মোক্ষম মনস্থির করেছি, আমি আমার সৃজনে যাদের প্রতি স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেছি, তাদের প্রত্যেককে জ্যান্তগোর থেকে খুঁড়ে তুলে প্রাণবন্ত করব। অর্থাৎ অর্ধমৃত করব। কারণ, আমি শক্তিমান লেখক নই। অদ্যাবধি বর্ণিত আমার তাবৎচরিত্রই জীবন্মৃত! অতএব এঁরাও অমৃত না হয়ে আমৃত হবেন। কিন্তু আমি তো নিষ্কৃতি পাব আমার জন্মপাপ থেকে।

আমি যখন কাবুলে ছিলুম তখন সেখানকার ব্রিটিশ লিগেশনের সঙ্গে আমার কণামাত্র হৃদ্যতা হয়নি, 'দেশে-বিদেশে' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সে-কথা হয়তো স্মরণ করতে পারবেন। তবে লিগেশনের একজন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে আমার অত্যন্ত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইনি পেশাওয়ারের খানদানী বাসিন্দা। অতিশয় খাস পাঠান। এঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনও আপন গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে-শাদী করেননি। ইনি পেশাওয়ারের পুলিশ ইনস্পেকটর আহমদ আলীর অগ্রজ। নাম শেখ মহবুব আলী। ব্রিটিশ লিগেশনে তিনি ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেক্রেটারি।

এঁর মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ কূটনৈতিক আমি অষ্টকুলাচল

সপ্তসমুদ্র পরিক্রমা করেও দেখতে পাইনি। আমার বিশ্বাস, পাঠান যে সরল প্রকৃতি ধরে সে কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু এইসব সরল পাঠানদের যাঁরা সর্দার হন, যেমন মনে করুন ইপ্পাইয়ের ফকির, ইংরিজীতে বলে ফকীর অব ইপি (I Pi), তাঁদের মত ধুরন্ধর ইহসংসারে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শেখ মহবুব আলীই বলতেন, 'পাঠানরা হয় গাড়ল, নয় ঘড়েল। মাঝখানে কিছু নেই। পিগমিজ অ্যাণ্ড জাইণ্টস্, নো নর্মেল্‌স্।' অধ্যাপক বগদানফ এবং বেনওয়ার সঙ্গে তাঁর প্রচুর হৃদ্যতা ছিল। বগদানফ গত হয়েছেন। বেনওয়া আছেন, সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শতায়ু দিন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই মহবুব আলীর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সত্যাসত্য জানতে পারবেন।

মহবুব আলী বিলক্ষণ জানতেন, লিগেশনের ইংরেজ কর্তাদের সঙ্গে আমার অহি-নকুল সম্পর্ক। ওদিকে তিনি যদিও ইংরেজের সেবা করতেন, তবু ভিতরে ভিতরে ওদের তিনি দিল্-জান্ দিয়ে করতেন ঘেন্না, 'ঘৃণা' নয়—ঘেন্না। এটা অবশ্য আমার নিছক অনুমান। মহবুব আলীর মত ঝাণ্ডু চাণক্য বাক্য বা আচরণে সেটা প্রকাশ করবেন, সে চিন্তাও বরাহভক্ষণসম মহাপাপ। বোধ হয় প্রধানত এই কারণেই তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তদুপরি আমি আহমদ আলীর বন্ধু। এবং সর্বশেষ সত্য, আমি বহুদূরদেশাগত রোগাপটকা, নির্বান্ধব, দুনিয়াদারি-বাবদে-বেকুব বাঙালী! এমত অবস্থায় আপনি ভগবানের শরণ না নিয়ে পাঠানের শরণ নিলেই বিবেচকের কর্ম করবেন। তবে এ-কথাও বলব, আমি তাঁর শরণ নিইনি। তিনিই আমাকে অনুজরূপে তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

সে-কথা থাক্। আমি আজ তাঁর জীবনী লিখতে বসিনি। আমি লিখতে বসেছি, তাঁর স্ত্রীর পরিচারিকা সম্বন্ধে। উন্নাসিক পাঠক বিরক্ত হয়ে আমার বাকী লেখাটুকু পড়বেন না, সে-কথা

আমি জানি; কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষম জানি, আমি যে গুণীজনের মজলিসে দৈবেসৈবে মুখ খোলার অনুমতি পাই, তাঁদের পৌনে ষোল আনা সহৃদয় সদাশয় জন। তাঁদের অকৃপণ হৃদয় জন্মদাসী রাজরাণী সবাইকে আসন দিতে জানে।

আমার সঙ্গে মহবুব আলীর হৃদ্যতা হওয়ার কয়েকদিন পর আমার ভৃত্য এবং সখা আবদুর রহমান আমাকে যা জানালে তার সারাংশ এই :—

মহবুব আলীর পরিবার এবং অন্য এক পরিবারের দুশমনী-লড়াই ক্ষান্ত দেবার জন্য একদা স্থিরীকৃত হয়, দুই পরিবার যেন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মহবুব আলী এ-পরিবারের বড় ছেলে। তাই তাঁকেই বিয়ে করতে হল অন্য পরিবারের বড় মেয়েকে। নবদম্পতি গোড়ার দিকে সুখেই ছিলেন। ইতিমধ্যে বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ মহবুব আলীর এক অতি দূর চাচাতো ভাই তাঁর শ্বশুর-পরিবারের ততোধিক দূর এক মামাতো ভাইকে খুন করে। ফলে মহবুব আলীর স্ত্রী পিতৃগণের আদেশানুযায়ী স্বামিগৃহ বর্জন করে পিত্রালয়ে চলে যান।

আবদুর রহমানের কাহিনী অনুযায়ী এ-ঘটনা ঘটেছিল বছর দশেক পূর্বে। বলতে গেলে এই অবধি মহবুব আলী অকৃতদার। অধুনা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি শীঘ্রই হিন্দুস্থান থেকে বিয়ে করে অন্য বিবি নিয়ে আসছেন।

সুহৃদ সম্বন্ধে তাঁর অপরোক্ষ আলোচনা করা অসঙ্গত, তা সে ভৃত্যের সঙ্গেই হক আর পিতৃব্যের সঙ্গেই হক—এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আবদুর রহমান যখন একবার কথা বলতে আরম্ভ করে তখন তাকে ঠেকানো অসাধ্য ব্যাপার।

শেষটায় আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলুম, 'তোমার এসব বলার কি দরকার? আমারই এসব জেনে কি হবে? তিনি তো

আমাকে এসব কিছু বলেননি ?'

আবহুর রহমান বললে, 'তিনি কেন বলেননি সে-কথা আমি কি করে জানব? (পরে মহবুব আলীর কাছে শুনেছিলাম, ছঃখের কথা নাকি বন্ধু বন্ধুকে বলে না) তবে আপনার তো জানা উচিত।' আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হয়।

তবে রাত্রে আমার গায়ে লেপ-কম্বল জড়িয়ে দেবার সময় আবহুর রহমান বলেছিল, 'শেখ মহবুব আলী খান বড় ভাল লোক।'

আবহুর রহমান সার্টিফিকেট দেবার সময় রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। এ-কথা বলে রাখা ভাল।

শেখ মহবুব আলীর বাসাতে আমি সময় পেলেই যেতুম। তাঁর বাসাটি লিগেশনের প্রত্যন্ত-প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলে ইংরেজের ছায়া না মাড়িয়ে সেখানে পৌঁছনো যেত। তিনি দফ্‌তরে থাকলে তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধু এবং চাকর গফুর খান তাঁকে খবর দিতে যেত। আমি ততক্ষণে ড্রইং-রুমে বসে আগুন পোয়াতুম, আর বাবুর্চীকে সবিস্তার বয়ান দিতুম কোন্ কোন্ বস্তু খাওয়া আমার বাসনা।

শেখ গফুর ফিরে এসেই আমার পায়ের কাছে বসে ভাঙা ভাঙা উর্হু-ফার্সী-পাঞ্জাবী-পশতুতে মিশিয়ে গল্প জুড়ে দিত। পাঠানদের ভিতর জাতিভেদ নেই। শেখ গফুর আর শেখ মহবুব আলী খান প্রভু-ভৃত্য হলেও তাদের সম্পর্ক ছিল সখ্যের। তাই গফুর আমার সঙ্গে গল্প করাটা তার কর্তব্য বলে মনে করত; আমি 'ভদ্রসন্তান', তার সঙ্গে গল্প করে যে তাকে 'আপ্যায়িত' করছি, সে-কথা তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হত। আবহুর রহমান এবং গফুরে যে সৌহার্দ্য ছিল, সেকথা বলা বাহুল্য।

সচরাচর মহবুব আলীর ড্রইং-রুম খোলাই থাকত।

আবহুর রহমান রচিত মহবুব আলীর 'পারিবারিক প্রবন্ধ'

শোনার কয়েকদিন পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে ড্রইং-রুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি, সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার হ্যাণ্ডেলের কাছে তখন দেখি বিজলির বোতাম, কলিং বেল। একটুখানি আশ্চর্য হয়ে ভাবলুম, মহবুব আলী আবার কবে থেকে পর্দানশিন হলেন, তাঁর গৃহে মাতা নেই, অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা পর্যন্ত নেই, তাঁর গৃহ তো অরণ্যসম। অরণ্যকে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করার কা কস্য প্রয়োজন ? দিলুম বোতাম টিপে, সঙ্গে সঙ্গে ডাকলুম, 'ভাই গফুর!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ভেবেছিলুম দেখব গোট্টা-গোট্টা গল-কম্বল দাড়ি সম্বলিত বেঁটে গফুর মহম্মদ খান। দেখে হকচকিয়ে গেলুম—দেখি, দীর্ঘ এবং তন্বঙ্গী একটি মেয়ে। পরনে লম্বা শিলওয়ার আর হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসা কুর্তা। ওড়না দিয়ে মাথার আধেক অবধি ঘোমটা।

শ্যামা। এবং সে অতি মধুর শ্যামবর্ণ। পেশাওয়ার কাবুলে মানুষের রঙ হয় ফরসা, কিংবা রোদে-পোড়া বাদামী। এ-মেয়ের রঙ সেই শ্যাম, যেটি পর্দানশিন বাঙালী মেয়ের হয়। তার কী তুলনা আছে ?

বলতে সময় লাগল। কিন্তু প্রথম দিন তাকে দেখেছিলুম এক লহমার তরে এবং আমি তাকে ভাল করে দেখবার পূর্বেই সে দিয়েছিল ভিতরপানে ছুট। তখন লক্ষ্য করেছিলুম, সেও আধ লহমার তরে, গুরুগামিনী রমণীর যে যে স্থলে বিধাতা সৌন্দর্য পুঞ্জীভূত করে দেন, তন্বঙ্গীর দেহে তার কিছুমাত্র কার্পণ্য করেননি; বরঞ্চ বলব, তিনি অজন্তার চিত্রকরের মত একটু যেন বাড়াবাড়ি করেছেন। অথচ বয়স পনের-ষোল হয় কি না-হয়। তবে কি বিধাতা মানুষের আঁকা ছবি দেখে তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য বাড়ান ?

তা সে যাকগে। তখন কি আর অত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলুম, না, ওই বিষয়ে চিন্তাই করেছিলুম!

আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসলুম; খানিক পরে মহবুব আলী এলেন। পাশে বসে ডাক দিলেন, 'ম-অ-অ-অ-ণি—'

মণি দোরের আড়ালে দাঁড়ালে, দুজনাতে পশতু ভাষায় কথাবার্তা হল। আমি তার একবর্ণও বুঝতে পারলুম না। মহবুব আলী আমাকে বললেন, 'মোটা রান্না এখনও বাবুর্চীই করে, কিন্তু মণির হাতে তৈরী নাশতা না হলে আমার বিবির চলে না। মণি বললে, আপনি কী খেতে ভালবাসেন সে ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে এবং তৈরী করেছে। ভালই হল। ও বড় তেজী মেয়ে। যাকে অপছন্দ করে তার রুটিতে হয়তো সেঁকো বিষ দেবে।'

দাবা খেলতে বসলুম এবং যথারীতি হারলুম। খেলার মাঝখানে মণি এসে অন্য টেবিলে নাশতা সাজালে।

সময় নিয়েছে বটে কিন্তু রেঁধেছে ভাল। মমলেটের রঙটি সর্বাঙ্গে সোনালী হলদে। এখানে বাদামী, সেখানে হলদে, ওখানে সাদা নয়। তে-কোণা পরোটাও তৈরী করেছে যেন টিস্কয়ার সেটস্কয়ার দিয়ে। ভিতরে ভাঁজে ভাঁজে কোন জায়গায় কাঁচাও নয়।

খাওয়া শেষ হলে আমি বললুম, 'আধ ঘণ্টাটাক বসে যাই। সেঁকো বিষ দিয়েছে কি না তার ফলাফল দেখে যাই।' মণি দাঁড়িয়ে ছিল। সে মহবুব আলীর মুখের দিকে তাকাল। তিনি পশতুতে অনুবাদ করলেন। মণি 'যাঃ' কিংবা ওই ধরনের কিছু বলে চলে গেল।

ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে তখন ওই কাঁচা রসিকতাটুকুও করতুম না।

ইতিমধ্যে মহবুব আলী আমার বাড়িতে একবার এসেছিলেন

বলে আমি তাঁর বাড়ি গেলুম দিন পনের পরে। এবারে বাইরের বোতামে চাপ দেওয়া মাত্রই খুট করে দরজা খুলে গেল।

মণি আমাকে দেখে নিঃসঙ্কোচে পশতু ভাষায় কিচির মিচির করে উঠল। কিছুতেই থামতে চায় না। আমি একবার সামান্য সুযোগ পেয়ে বললুম, 'পশতু,' তারপর বাঁ হাত উপরের দিকে তুলে ভরতনাট্যম্ কায়দায় পদ্মফুল ফোটাবার মুদ্রা দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম 'ডডনং।' অর্থাৎ আমি পশতু বুঝিনে। কিন্তু কেবা শোনে কার কথা! ভরতনাট্যমে আমি যদি হই খুচরো কারবারী, মণির বেসাতি দেখলুম পাইকিরী লাটের। ডান হাত দিয়ে এক অদৃশ্য ঝাঁটা নিয়ে আকাশের বেশ খানিকটা ঝাঁট দেবার মুদ্রা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, 'কুছ পরওয়া নহী।' কিন্তু শুধু মুদ্রা দিয়ে তো আর বেশীক্ষণ কথাবার্তা চালানো যায় না। তা হলে মানুষ ভাষার সৃষ্টি না করে শুধু নেচে কুঁদে ও মুদ্রা দেখিয়েই শঙ্করদর্শনের আলোচনা চালাত, একে অন্যকে এটম বম্ বানাবার কৌশল শেখাত।

ইতিমধ্যে গফুর এসে আমার পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসে জানালে মহবুব আলী শহরে গেছেন, ফিরতে দেরী হবে। তবে পই পই করে বলে গিয়েছেন, আমাকে যেন আটকে রাখা হয়। মণি ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে গিয়েছে।

গফুর তার মনিবের সঙ্গে যে-রকম খোলা-দিলে গল্প জমায়, আমার সামনে সেই ভাবেই উজির-নাজির কত্‌ল্ করতে আরম্ভ করল। আশকথা-পাশকথা সেরে শুধালে, 'মণিকে আপনার কি রকম লাগে?'

আল্লা জানেন, মৌলা আলীর দোহাই, আমি স্নব নই। দাসী পরিচারিকা সম্বন্ধে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করতে আমার কণামাত্র আপত্তি নেই। আমার সেবক আবদুর রহমানের সঙ্গে

আমার যে ভাবের আদান-প্রদান রঙ্গ-রসিকতা চলত, সে-রকম ধারা আমি বহু 'শিক্ষিত' 'খানদানী' লোকের সঙ্গে করতে রাজী নই। কিন্তু এখানে তো ব্যাপারটা ততখানি সরল নয়। তাই একটু বিরক্তির সুরে বললুম, 'আমার লাগা-না-লাগার কি আছে?'

গফুর আমার উত্তর শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে বললে, 'এ আপনি কি বলছেন! আপনি শেখ মহবুব আলীর দোস্ত! তাঁর ইষ্টকুটুম, গোষ্ঠীপরিবারের পাঠান-পখতুনের চেয়ে আপনাকে উনি ঢের ঢের বেশী ভালবাসেন। আর আপনি যে-ভাবে কথা বললেন, তাতে মনে হল ওঁর পরিবারের জন্য আপনার যেন কোন দরদ নেই। আজ যদি মণির বিয়ের সম্বন্ধ আসে তবে কি মহবুব আলী আপনার সঙ্গে ওই বাবদে সলা পরামর্শ না নিয়ে থাকতে পারবেন?'

আমি শুধালুম, 'এসেছে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললুম, থুড়ি, ভুল করলুম, এতখানি ঔৎসুক্য দেখানো উচিত হয়নি। 'শাদীর পয়লা রাতে বেড়াল মারবে,' এ যে দুসরা রাত খতম হবার উপক্রম!

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করেই গফুর সোৎসাহে বললে, 'গণ্ডায় গণ্ডায়। সুবে পেশাওয়ার-কোহাট, বন্নু-ডেরাইসমাইল খান, ইস্তেক জম্মু-জলন্ধর অবধি। লিগেশনের সব কটা পাঠান চাপরাশী-দফতরী, কেরানী-খাজাঞ্চী মণিকে শাদী করতে চায়।'

আমি জানতুম, পাঠানদের আপন গোষ্ঠীর ভিতর জাতবিচার নেই। কিন্তু সেটা ছিল থিয়োরেটিকল জানা, এখন দেখলুম সেটা কী রকম মারাত্মক প্র্যাকটিকল! লিগেশনের খাজাঞ্চী মেলের লোকও পরিচারিকা মণিকে বিয়ে করতে চায়!

ইতিমধ্যে মণি দু-তিনবার ঘরে এসে অগ্নিবাণ হেনে গফুরের দিকে তাকিয়েছে। ভাষা না জেনেও বুঝতে পেরেছে, ওর সম্বন্ধেই

কথাবার্তা হচ্ছে। আমি গতিক সুবিধের নয় দেখে বললুম, থাক্-থাক্।'

মণি আমার জন্য এক অজানা পেশাওয়ারী কাবাব বানিয়েছে। ভারি মোলায়েম। দেখে মনে হয় কাঁচা, কিন্তু হাত দিয়ে মুখের কাছে তুলতে না তুলতেই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে। আমি আগের থেকেই হাঁ করে ছিলুম; মুখে কিছু পৌঁছল না দেখে, মণি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে ভিতরের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করল।

মহবুব আলী এলেন। দাবার ফাঁকে বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'কিস্তি সামলান। ঘোড়া উঠে, নৌকা ঘোড়ার ডবল কিস্তি।'

মহবুব আলী বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আমিও বিপদে পড়েছি। আবহুর রহমান বলছিল এখন থেকে সবাইকে রাস্তায় দেরেশী পরে বেরুতে হবে। দরজীর দোকানে ভিড় লেগেছে। কি করি, বলুন তো?'

ততক্ষণে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি যথারীতি হেরে গিয়েছি।

পূর্বেই বলেছি, মহবুব আলী চাণক্যস্য চাণক্য। তাই এটাও জানেন, কখন সাফসফা খোলাখুলি কথা কইতে হয়। বললেন, 'মণিকে বিয়ে করার জন্য সব কটা পাঠান আমার দোরে ধন্না দিচ্ছে। ওদিকে মণি বলে, সে কাউকে বিয়ে করতে চায় না। কেন? আমার বিবি বললেন, সে নাকি—'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললুম, 'বাস্, বাস্।'

মহবুব আলী আমার উষ্মার জন্য তৈরী ছিলেন। আমার দুখানা হাত ধরে বললেন, 'দোস্ত, আমি জানি, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আপনি সৈয়দ-বংশের ছেলে। আপনারা পাঠান-মোগলে বিয়ে-শাদী করেন না। যদিও কুরান-হাদিসের রায়, যে-কোনও মুসলমান যে-কোনও মুসলমানীকে বিয়ে করতে পারে। হক কথা। কিন্তু লোকাচার দেশাচারও আছে। সেগুলো মানতে হয়। আজ যদি আপনি আমার বোন কিংবা শালীকে বিয়ে করে দেশে ফেরেন তবে আমি কোনও রকম দুশ্চিন্তা করব না। কিন্তু মণিকে বোঝাই কী করে, আপনার সঙ্গে তার বিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে ছেলে-বেলা থেকে দেখেছে যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে যে-কোনও ছেলের বিয়ে হয়। তা যে শুধু পাঠানদের ভিতরেই, সে কি করে জানবে বলুন? বাইরের সংসারে যে অন্য ব্যবস্থা, কি করে বুঝবে বলুন?'

আমি আরও বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আঃ! কী এক স্টর্ম-ইন-এ টি-পট। তিলকে তাল। আপনার বাড়ির মেয়ে কাকে বিয়ে করতে চায়, না-করতে চায়, তাতে আমার কি?'

মহবুব আলী শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার তাতে কি?'

আবদুর রহমানের উপদেশ স্মরণে এল। বললুম, 'না, না, আপনি আমাকে এতখানি হৃদয়হীন মনে করবেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাকে যেখানে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে, এবং যেস্থলে আমার হাতে কোনও সমাধান নেই, সেখানে আমি উপদেশই বা দিই কি প্রকারে?'

কাবুলে এপিডেমিক সর্দি-কাশি দেখা দিল। ঝাড়া দশ দিন ঘরে বন্ধ থাকতে হল। সেরে উঠে শুনি, মহবুব আলী আমার চেয়েও বে-এক্তেয়ার। ভেবেছিলুম কিছুদিন ও-পাড়া মাড়াব না। তবু যেতে হয়।

এবারে মণি দরজা খুলেই যা পশতুর তুবড়িবাজি, বিডন-বিশপ ফল্‌স্ চালালে, তার সামনে আমি একদম হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে

রইলুম। কুমারী পার্বতী কাম্য পতিনিন্দা শুনে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়েছিলেন, আমি উলটো অবস্থায়। ফল কিন্তু একই।

লক্ষ্য করলুম, মণিকে ভয়ঙ্কর রোগা দেখাচ্ছে। ফার্সীতে শুধালুম, 'সর্দি হয়েছিল নাকি?' মণি একবর্ণ ফার্সী বোঝে না। খলখল করে হেসে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

মহবুব এলেন লাঠিতে ভর করে। ঠাণ্ডা দেশের সর্দি, যাবার বেলা মানুষকে অর্ধমৃত করে দিয়ে যায়। বিশেষ করে যাদের চর্বি নিয়ে কারবার।

আমি জানতুম ওই কথাই উঠবে, যদিও আশা করেছিলুম নাও উঠতে পারে। মণির উত্তেজনা থেকে অবশ্য আমেজ করেছিলুম, আরও কিছু একটা হয়েছে।

বললেন, 'ওই যে আমাদের ছোকরা চাপরাশী মাহমুদ জান, রাসকেল না ইডিয়ট কী বলব! সে-ই ঘটিয়েছে কাণ্ডখানা। আপনি যখন দিন সাতেক এলেন না তখন ওই মাহমুদ মণিকে একটা খাসা আরব্য উপন্যাস শোনালে। রাসকেলটা গল্প বানাতে আস্ত পাঠান। সে মণিকে বললে, "বাদশা আমানউল্লা খান সৈয়দ সায়েবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এ-দেশে বিয়ে না করে দামড়ার মত ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত অনুচিত। লোকনিন্দা হয়, বিশেষ করে আপনি যখন শিক্ষক। তারপর সৈয়দ সায়েবের হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর মেয়ে-ইস্কুলে। সেখানে দু শো মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুকুম দিলেন, বেছে নাও। সৈয়দ সায়েব আর কী করেন! শাহানশাবাদশার হুকুম। না মানলে গর্দান। আর মেয়েগুলোই বা কি কম খাপসুরত! সৈয়দ সায়েব বিয়ে করে মশগুল। তাই এ দিকে আসার ফুরসত তাঁর আর কই"।'

আমি জীবনে ওই একবারই গীতাবর্ণিত নিষ্কম্প প্রদীপশিখাবৎ!

মহবুব আলী বললেন, 'মণি তো চীৎকার করে কান্নাকাটি

জুড়ে দিল। তার পর শয্যা নিল ড্রইং-রুমের দরজার গোড়ায়। একটানা রোজার উপবাস। রাত্রেও খায় না—'

আমি শুধালুম, 'মণি বিশ্বাস করলে ওই গাঁজাখুরি?'

'কেন করবে না? মণি মাঝে মাঝে মোটরে করে আমার বিবির সঙ্গে শহরে যায়। পথে পড়ে মেয়েই-ইস্কুল। দেখেছে, মেয়েগুলোর বরফের মত ফরসা রঙ, বেদানার মত ট্যাবাট্যাবা লাল গাল, ধনুকের মত ভুরু—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্। আপনাকে আর কবিত্ব করতে হবে না। কিন্তু আমি তো পছন্দ করি শ্যামবর্ণ—'

এইবারে মহবুব আলীর মুখে ফুটল মধুর হাসি। হ্যাকরাগলা, আবদেরে-আবদেরে সুরে বললেন, 'তাহলে মণিকে ডেকে সেই সুসমাচার শুনিয়ে দি, এবং এটাও বলব কি যে, আপনি মণিকে কাবুলী মেয়েদের চেয়ে বেশী খাপসুরত বলে মনে করেন?'

আমি তো রেগে টঙ। চিৎকার করে বললুম, 'বলুন, বলুন, বিশ্বসুদ্ধকে বলুন আমার কি আপত্তি? মণি যখন বিশ্বাস করে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তখন তো আপনার সব সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে।'

মহবুব আলী হাসলেন, আরও মধুর হাসি। আমার গা জ্বলে গেল।

অমিয় ছানিয়া বললেন, 'ওই তো আপনার ভুল। তাই যদি হত তবে আপনাকে দেখামাত্রই মণি হাসির বন্যা জাগাল কেন? চিৎকার করে তখন কী বলেছে, শুনেছেন? না, আপনি পশতু বোঝেন না। বলেছে, "ওঁর হাতে মেহদীর দাগ নেই, উনি বিয়ে করেননি"!'

আমি চুপ। শেষটায় কাতরকণ্ঠে শুধালুম, 'মেহেদীর দাগ ছাড়া কি কখনও বিয়ে হয় না?'

মহবুব আলী বললেন, 'বোঝান গিয়ে মণিকে। আপনাকে কতবার বলেছি, ও পাঠান-মেয়ে, ও বোঝে পাঠানদের কায়দা-কানুন। ও শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় পাঠান-জগতে। বিশ্বভুবনের খবর ও রাখে না।'

আমি শুধালুম, 'আপনাকে গতবারে দেখেছিলুম, এ-ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সেটা হঠাৎ কেটে গেল কি প্রকারে? আমার তো মনে হচ্ছে জিনিসটে আরও বেশী প্যাঁচালো হয়ে যাচ্ছে।'

তিনি বললেন, 'পাঠান-মেয়েরা সচরাচর বাপ-চাচার আদেশমত নাক-কান বুজে বিয়ে করে। কিন্তু হঠাৎ কখনও যদি পাঠান-মেয়ে কাউকে ভালবেসে ফেলে, তখন সে আগুনে হাত না দেওয়াই ভাল। ব্যাপারটার গুরুত্ব গোড়ার দিকে আমি বুঝতে পারিনি; তাই আর একটা সমাধান খুঁজছিলুম। এখন নিরাশ হয়ে অভয় মেনে বসে আছি।'

আমি আর কি বলব? অত্যন্ত চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরলুম।

সমস্যার ফয়সালা করে দিল বাচ্চায়ে সকাও কাবুল আক্রমণ করে। আমি থাকি শহরের মাঝখানে, ব্রিটিশ লিগেশন শহরের বাইরে মাইল দেড়েক দূরে। বাচ্চা এসেছে সেদিক থেকেই এবং থানা গেড়েছে লিগেশন আর শহরের মাঝখানে। লিগেশন আর শহর একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেখানে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কয়েকদিন পরে বাচ্চায়ে হটে গেল। তখন ব্রিটিশ প্লেন এসে বিদেশী মেয়েদের পেশাওয়ার নিয়ে যেতে লাগল। খবর পেয়েই ছুটে গেলুম আমার বন্ধু মৌলানা জিয়াউদ্দীনের স্ত্রীর জন্য একটা সীট যোগাড় করতে।

মহবুব আলীর কলিং-বেল টেপা মাত্রই এবারে দরজা খুলল না। তখন হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ পর মহবুব আলী এলেন। মুখ বিষণ্ণ। কোন ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কাবুল নিরাপদ স্থান নয় বলে লিগেশনের সব মেয়েদের পেশাওয়ারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার স্ত্রী চলে গিয়েছেন। মণিও গেছে।'

আমি বলতে চাইলুম, 'ভালই হল,' কিন্তু বলতে পারলুম না।

তারপর বললেন, 'আপনাকে বলে কি হবে, তবু বলি। যে কদিন শহর লিগেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে কদিন এখানে অনেক রকম গুজব পৌঁছত, কেউ বলত কাবুলে লুটতরাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, কেউ বলত বিদেশীদের সব খুন করে ফেলা হয়েছে। আর মণি ছুটোছুটি করেছে, এ-চাপরাশী থেকে ও-চাপরাশীর কাছে, এ-আরদালীর কাছ থেকে ও-আরদালীর কাছে। টাকা দিয়ে লোভ পর্যন্ত দেখিয়েছে, আপনার কুশল সংবাদ নিয়ে আসবার জন্যে।'

আমি চুপ।

তারপর যখন সে জানতে পারলে তাকেও আমার স্ত্রীর সঙ্গে পেশাওয়ার চলে যেতে হবে তখন এক বিপর্যয় কাণ্ড করে তুললে। কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে বললে, সে কিছুতেই দেশে ফিরে যাবে না। এক রকম গায়ের জোরে তাকে প্লেনে তুলে দিতে হল।

আমি কিছু বলিনি।

কাবুলে অনেক কষ্ট সওয়ার পর একদিন খবর পেলুম, অ্যারোপ্লেনে জিয়াউদ্দীন ও আমার জন্য জায়গা হয়েছে। আগের রাত্রে মহবুব আলী আমাকে 'গুডজর্নি বঁভইয়াজ' জানাতে

এলেন। বিদায়ের সময় আমাকে একটা মোটা খাম দিয়ে বললেন, 'আপনি পেশাওয়ারে পৌঁছে আমার শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে মণিকে খবর দেবেন। মণি এলে তার হাতে খামটা দিয়ে বলবেন— এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।'

আমি বললুম, 'আমি তো পশতু বলতে পারিনে।'

তিনি কথা কটি উর্দু হরফে লিখে বার তিনেক আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিলেন।

অ্যারোপ্লেনে বসে পরের দিন অনেক চিন্তা করেছিলুম। কি চিন্তা করেছিলুম, সে-কথা দয়া করে জিজ্ঞেসা করবেন না।

পেশাওয়ার পৌঁছেই গেলুম মহবুব আলীর শ্বশুর-বাড়ি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, দুই মুরুব্বীস্থানীয় বৃদ্ধ বসে আছেন। আমি মহবুব আলীর কুশল সংবাদ জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ জানালুম, মণিকে একটু খবর দিতে। ভদ্রলোকরা একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললেন, 'খবর দিচ্ছি'। এরা চমকে উঠলেন কেন? তবে কি এ-বাড়ির মেয়েরা বৈঠকখানায় আসে না? তা হলে মহবুব আলীর সেটা বোঝা উচিত ছিল।

মণি এল। আমাকে দেখে অন্দরের দোরের গোড়ায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। মুখে কথা নেই। মুরুব্বীদের দিকে একবার তাকালে। তাঁরা তখন অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছেন। মণি মৃদুকণ্ঠে একটি শব্দ শোধালে, 'সলামত?' কথাটা ফার্সী। হয়তো পশতুতেও চলে। অর্থ, 'কুশল?'

আমি ঘাড় নাড়িয়ে বললুম, 'হ্যাঁ'।

তারপর তার কাছে গিয়ে খামটা দিয়ে সেই শেখা বুলিতে পশতুতে বললুম, 'এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।' মণির মুখ খুশীতে ভরে উঠল। যা বলল সে-ভাষা না জেনেও বুঝতে

পারলুম, সে বলছে, 'পশতু তা হলে শিখেছেন ?'

আমি দুঃখ দেখিয়ে ঘাড় নাড়িয়ে 'না' জানালুম।

মণি ভিতরে চলে গেল।

আমি উঠি-উঠি করছিলুম এমন সময় চাকর এসে বললে কিছু খেয়ে যেতে। পাঠানের বাড়িতে না খেয়ে চলে যাওয়া বড় বেয়াদবি।

মণি টেবিলে খাবার সাজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়াল।

একটিও কথা বলল না।

বাড়ি থেকে বেরবার সময় একবার পিছনের দিকে তাকালুম, মণিকে শেষ সেলাম জানাবার জন্য। কোথাও দেখতে পেলুম না।

টাঙ্গাতে উঠে উলটো দিকে মুখ করে বসতেই নজর গেল দোতলার বারান্দার দিকে। দেখি, মণি দাঁড়িয়ে। মাথায় ওড়না নেই। আর দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, লম্বা লম্বা ধারা বয়ে।

টাঙ্গা মোড় নিল।

সেই রাত্রে দেশের ট্রেন ধরলুম।

ব্যারোমিটার দেখে, কাগজ-পত্র ঘেঁটে জানা যায়, লাল-দরিয়া এমন কিছু গরম জায়গা নয়। জেকবাবাদ পেশাওয়ার দূরে থাক, যাঁরা পাটনা-গয়ার গরম ভোগ করেছেন তাঁরা আবহাওয়া-দপ্তরে তৈরী লাল-দরিয়ার জন্মকুণ্ডলী দেখে বিচলিত তো হবেনই না, বরঞ্চ ঈষৎ মৃদু হাস্যও করবেন। আর উন্নাসিক পর্যটক হলে হয়তো প্রশ্ন করেই বসবেন, 'হালকা আল্‌স্‌টারটার দরকার হবে না তো!'

তবে প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে, লাল-দরিয়া আমাকে যেন পার্ক সার্কাসের হোটেলে খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক-কাবাব ঝলসাচ্ছে। ভুল বললুম ; মনে হয়েছে, যেন হাঁড়িতে ফেলে ঢাকনা লেই দিয়ে সেঁটে আমাকে 'দম-পুখতে'র রান্না বা **'পুটপক্ব'** করেছে। ফুটবলীদের যে রকম 'বগি-টিম' হয়, লাল-দরিয়া আমার 'বগি-সী'।

সমস্ত দিনটা কাটাই জাহাজের বৈঠকখানায় হাঁপাতে হাঁপাতে আর বরফভরতি গেলাসটা কপালে ঘাড়ে নাকে ঘষে ঘষে, আর রাতের তিনটে যামই কাটাই রকে অর্থাৎ ডেকে, তারা গুনে গুনে। আমার বিশ্বাস, ভগবান লাল-দরিয়া গড়েছেন চতুর্থ ভূতকে বাদ দিয়ে। ওর সমুদ্রে যদি কখনও হাওয়া বয় তবে নিশ্চয়ই কিম্‌-ভূতই বলতে হবে।

তাই সে রাত্রে ব্যাপারটা আমার কিম্ভুত বলেই মনে হল।

ডেক চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা। এমন সময় কানে এল, সেই লাল-দরিয়ায়, দেশ থেকে বহুদূরের সেই সাত সমুদ্রের এক সমুদ্রে—সিলেটের বাঙাল ভাষা। স্বপ্নই হবে। জানতুম, সে-জাহাজে আমি ছাড়া আর কোনও সিলেটী ছিল না। এরকম মরমিয়া সুরে মাঝ রাতে, কে কাকে 'ভাই, হি কথা যদি

তুলচস'—বলতে যায়? খেয়ালী-পোলাও চাখতে, আকাশকুসুম শুঁকতে, স্বপ্নের গান শুনতে কোনও খরচা নেই; তাই ভাবলুম চোখ বন্ধ করে স্বপ্নটা আরও কিছুক্ষণ ধরে দেখি।

কিন্তু ওই তো স্বপ্নের একটিমাত্র দোষ। ঠিক যখন মনে হবে, বেশ জমে আসছে, ঠিক তখনই ঘুমটি যাবে ভেঙে। এ স্থলেও সে আইনের ব্যত্যয় হল না। চোখ খুলে দেখি, সামনে—আমার দিকে পিছন ফিরে দুজন খালাসী চাপা গলায় কথা বলছে।

বেচারীরা! রাত বারোটার পর এদের অনুমতি আছে ডেকে আসবার। তাও দল বেঁধে নয়। বাকি দিনের অসহ্য গরম তাদের কাটাতে হয় জাহাজের পেটের ভিতরে।

সিলেট-নোয়াখালীর লোক যে পৃথিবীর সর্বত্রই জাহাজে খালাসীর কাজ করে সে-কথা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, তারা কাজ করে মাল-জাহাজেই; এই ফরাসী যাত্রী-জাহাজে রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তাও আবার নোয়াখালী-চাটগাঁয়ের নয়, একদম খাঁটি আমার আপন দেশ সিলেটের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার সম্ভাবনা স্বপ্নেই বেশী, বাস্তবে কম।

এরা কথা বলছিল খুবই কম। যেটুকু শুনতে পেলুম, তার থেকে কিন্তু এ-কথাটা স্পষ্ট বোঝা গেল, এদের একজন এই প্রথম জাহাজের 'কামে' ঢুকেছে এবং দেশের ঘরবাড়ির জন্য তার মন বড্ড উতলা হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গী পুরনো লোক; নতুন বউকে যে-রকম বাপের বাড়ির দাসী সান্ত্বনা দেয়, এর কথার ধরন অনেকটা সেই রকমের।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলুম। শেষটায় যখন দেখলুম, ওরা উঠি-উঠি করছে তখন আমি কোনও প্রকারের ভূমিকা না করেই হঠাৎ অতি খাঁটি সিলেটীতে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বাড়ি সিলেটের কোন্ গ্রামে?'

সিলেটের খালাসীরা দুনিয়ার তাবৎ দরিয়ায় মাছের মত কিলবিল করে এ-সত্য সবাই জানে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের সত্য—সিলেটের ভদ্রসন্তান পারতপক্ষে কখনও বিদেশে যায় না। তাই লাল-দরিয়ার মাঝখানে সিলেটী শুনে আমার মনে হয়েছিল, ওটা স্বপ্ন; সেইখানে সিলেটী ভদ্রসন্তান দেখে ওদের মনে হল, আজ মহাপ্রলয় (কিয়ামতের দিন) উপস্থিত। শাস্ত্রে আছে, ওই দিনই আমাদের সকলের দেখা হবে একই জায়গায়। ভূত দেখলেও মানুষ অতখানি লাফ দেয় না। দুজন যে-ভাবে একই তালে-লয়ে লাফ দিল তা দেখে মনে হল ওরা যেন ওই কর্মটি বহুদিন ধরে মহড়া দিয়ে দিয়ে আসছে।

উভয় পক্ষ কথঞ্চিৎ শান্ত হওয়ার পর আমি সিগারেট-কেস খুলে ওদের সামনে ধরলুম। দুজনেই একসঙ্গে কানে হাত দিয়ে জিভ কাটল। আমাকে তারা চেনে না বটে—আমি দেশ ছেড়েছি ছেলেবেলায়—তবে আমার কথা তারা শুনেছে এবং আমার বাপ-ঠাকুরদার পায়ের ধূলো তারা বিস্তর নিয়েছে, খুদাতালার বেহদ্ মেহেরবানি, আজ তারা আমার দর্শন পেল, আমার সামনে ওসব তওবা, তওবা ইত্যাদি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দেশের চাষা ইয়োরোপীয় চাষার চেয়ে ঢের বেশী ভদ্র।

খালাসী-জীবনের কষ্ট এবং আর-পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথাও হল। দুঃখের কথাই পনের আনা তিন পয়সা। বাকি এক পয়সা সুখ—অর্থাৎ মাইনেটা, সেই এক পয়সাই পঁচাত্তর টাকা। ওই দিয়ে বাড়ি-ঘর ছাড়াবে, জমিজমা কিনবে।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালুম, 'আহারাদি?' রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে।

বললে, 'ওই ত আসল দুঃখ হুজুর। আমি তো তবু পুরনো লোক। পাউরুটি আমার গলায় গিঁট বাঁধে না। কিন্তু এই ছেলে-টার জান পান্তাভাতে পোঁতা। পান্তাভাত! ভাতেরই নেই খোঁজ,

ও চায় পান্তাভাত! মূলে নেই ঘর পূব দিকে তিন দোর। হুঁঃ।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কী কথা! আমি তো শুনেছি, আর কিছু না হক, তোমাদের ডাল-ভাত প্রচুর খেতে দেয়। জাহাজের কাম করে কেউ তো কখনও রোগা হয়ে দেশে ফেরেনি।'

বললে, 'ঠিকই শুনেছেন, সায়েব। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে কি, কোনও কোনও বন্দরে এখন চাল মাগ্‌গি। সারেঙ আমাদের রুটি খাইয়ে চাল জমাচ্ছে ওই সব বন্দরে লুকিয়ে চাল বিক্রি করবে বলে। সারেঙ দেশের জাতভাই কিনা, না হলে অন্ন মারার কৌশল জানবে কি করে?'

আমি বললুম, 'নালিশ ফরিয়াদ করনি?'

বললে, 'কে বোঝে কার বুলি? এদের ভাষায় কি জানি "ফিঞ্চি" না কী, সারেঙই একটুখানি বলতে পারে। ইংরিজী হলেও না হয় আমাদের মুরুব্বীদের কেউ কেউ ওপরওয়ালাদের জানাতে পারতেন। ওই তো সারেঙের কল! ধন্যি জাহাজ! ব্যাটারা শুনেছি কোলা ব্যাঙ ধরে ধরে খায়! সেলাম সায়েব, আজ উঠি। দেরি হয়ে গিয়েছে। আপনার কথা শুনে জানটা—'

আমি বললুম, 'ব্যস্ ব্যস্।'

মাঝরাতের স্বপ্ন আর শেষরাতের ঘটনা মানুষ নাকি সহজেই ভুলে যায়। আমার আবার চমৎকার স্মৃতিশক্তি—সব কথাই ভুলে যাই। তাই ভাতের কেচ্ছা মনে পড়ল, দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় রাইস-কারি দেখে।

জাহাজটা ফরাসিস ফরাসিসে ভর্তি। আসলে এটা ইণ্ডো-চীন থেকে ফরাসী সেপাই লস্কর লাদাই করে ফ্রান্স যাবার মুখে পণ্ডিচেরিতে একটা ঢুঁ-মেরে যায়। প্যাসেঞ্জার মাত্রই পল্টনের লোক। আমরা গুটিকয়েক ভারতীয়ই উটকো মাল। খানা-

টেবিলে আমার পাশে বসত একটি ছোকরা স্যু-লিয়োৎনা—অর্থাৎ সাবঅলটার্ন। আমার নিতান্ত নিজস্ব মৌলিক ফরাসিসে তাকে রাত্রের ঘটনাটি গল্পচ্ছলে নিবেদন করলুম।

শুনে তো সে মহা উত্তেজিত। আমি অবাক। ছুরি কাঁটা টেবিলে রেখে, মিলিটারী গলায় ঝাঁজ লাগিয়ে বলতে শুরু করলে, 'এ ভারি অন্যায়, অত্যন্ত অবিচার, ইন্যুই—অন-হার্ড-অব—ফাঁতাস্তিক ফেনটাসটিক, আরও কত কী!'

আমি বললুম, 'রোস রোস। অত গরম হচ্ছ কেন? এ অবিচার তো দুনিয়ায় সর্বত্রই হচ্ছে, আকছারই হচ্ছে। এই যে তুমি ইন্দোচীন থেকে ফিরছ, সেখানে কোন্ ড্যানিয়েলগিরি করতে গিয়েছিলে, মো গার্সোঁ (বাছা)! ওসব কথা থাক, ছুটি খাও।'

ছোকরাটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল বলেই কথাটা বলবার সাহস হয়েছিল। বরঞ্চ ইংরেজকে এ-সব কথা বলবেন, ফরাসিসকে বললে, হাতাহাতি বোতল-ফাটাফাটির সম্ভাবনাই বেশী।

চুপ মেরে একটু ভেবে বললে, 'হুঁঃ। কিন্তু এ স্থলে তো দোষী তোমারই জাতভাই ইণ্ডিয়ান সারেঙ!'

আমি বিষম খেয়ে বললুম, 'ওই-য্-যা!'

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ এখনও দেখলুম না যেখানে মানুষ সুযোগ পেলে দুপুরবেলা ঘুমোয় না। তবু যে কেন বাঙালীর ধারণা যে, সে-ই এ ধনের একমাত্র অধিকারী তা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। আপন আপন ডেক-চেয়ারে শুয়ে, চোখে ফেটা মেরে আর পাঁচটি ফরাসিসের সঙ্গে কোরাসে ওই কর্মটি সবেমাত্র সমাধান করেছি, এমন সময় উর্দি-পরা এক নৌ-অফিসার আমার সামনে এসে অতিশয় সৌজন্যসহকারে

অবনত মস্তকে যেন প্রকাশ্যে আত্মচিন্তা করলেন, 'আমি কি মসিয়ো অমুকের সঙ্গে আলাপ করার আনন্দ লাভ করছি?'

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, আরও অবনত মস্তকে বললুম, আদপেই না। এ শ্লাঘা সম্পূর্ণ আমারই।'

অফিসার বললেন, 'মসিয়ো ল্য কমাদাঁ—জাহাজের কাপ্তান সায়েব—মসিয়োকে—আমাকে—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দাভিবাদন জানিয়ে প্রার্থনা করছেন যে, তিনি যদি মসিয়োর উপস্থিতি পান, তবে উল্লসিত হবেন।'

পাপাত্মা আমি। ভয়ে আঁতকে উঠলুম। আবার কী অপকর্ম করে ফেলেছি যে, মসিয়ো ল্য কমাদাঁ আমার জন্য হুলিয়া জারি করেছেন! শুকনো মুখে, ঢোক গিলে বললুম, 'সে-ই হবে আমার এ-জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান। আমি আপনার পথপ্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল।'

মসিয়ো ল্য কমাদাঁ যদিও যাত্রী-জাহাজের কাপ্তান, তবু দেখলুম তাঁর ঠোঁটের উপর ভাসছে আর-একখানি জাহাজ এবং সেটা সর্বপ্রকার বিনয় এবং স্তুতি-স্তোকবাক্যে টৈটম্বুর লাদাই। ভদ্রতার মানওয়ারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে মোদ্দা কথা যা বললেন, তার অর্থ আমার মত বহুভাষী পণ্ডিত ত্রিভুবনে আর হয় না, এমন কি প্যারিসেও হয় না।

এত বড় একটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক তথ্য তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করব করব করছি, এমন সময় তাঁর কথার তোড় থেকেই বেরিয়ে গেল, তিনি তিন শো তিরনব্বুই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এই প্রথম একটি মহাপণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন, যিনি তাঁর খালাসীদের কিচির-মিচিরের একটা অর্থ বের করতে পারেন। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তা হলে আমার মত আরও বহু লক্ষ পণ্ডিত সিলেট জেলায়

আছেন। তারপর তিনি অনুরোধ করলেন, আমি যদি দয়া করে তাঁর খালাসীদের অসন্তুষ্টির কারণটি খোলসা করে বর্ণনা করি, তবে তিনি বড় উপকৃত হন। আমি তা-ই করলুম। তখন সেই খালাসীদের আর সারেঙের ডাক পড়ল। তারা কুরবানির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হল।

কাপ্তান আর জজ ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী। সাক্ষীর বয়স কত, সেই আলোচনায় জজেরা হেসে খেলে সাতটি দিন কাটিয়ে দেন; কাপ্তানরা দেখলুম, তিন মিনিটেই ফাঁসির হুকুম দিতে পারেন। মসিয়ো ল্য কমাদাঁ অতি শান্ত কণ্ঠে এবং প্রাঞ্জল ফরাসীতে সারেঙকে বুঝিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে তিনি যদি আর কখনও এ-রকম কেলেঙ্কারির খবর পান, তবে তিনি একটিমাত্র বাক্যব্যয় না করে সারেঙকে সমুদ্রের জলে ফেলে তার উপর জাহাজের প্রপেলারটি চালিয়ে দেবেন।

যাক। বাঁচা গেল। মরবে তো মরবে সারেঙটা।

পানির পীর বদর সায়েব। তাঁর কৃপায় রক্ষা পেয়ে 'বদর বদর' বলে কেবিনে ফিরলুম।

খানিকক্ষণ পরে চীনা কেবিন-বয় তার নিজস্ব ফরাসীতে বলে গেল, খালাসীরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে আজ যেন আমি মেহেরবানি করে কেবিনে বসে তাদের পাঠানো 'ডাল-ভাত' খাই।

গোয়ালন্দী জাহাজের মামুলী রাইস-কারি খেয়েই আপনারা আ-হা-হা করেন, সেই জাহাজের বাবুর্চীরা যখন কোর্মা-কালিয়া পাঠায়, তখন কী অবস্থা হয়? নাঃ, বলব না। দু-একবার ভোজনের বর্ণনা করার ফলে শহরে আমার বদনাম রটে গিয়েছে, আমি পেটুক এবং বিশ্বনিন্দুক। আমি শুধু অন্যের রন্ধনের নিন্দা করতেই জানি। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছে। তামা-

তুলসী স্পর্শ করে এই শপথ করলুম—না, থাক্, আপনার বাড়িতে আমার মা-বোনদের আমি একটি লাস্ট চান্স দিলুম।

কাপ্তান সাহেব আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছেন। খালাসীরা তাই এখন নির্ভয়ে খাবার নিয়ে আমার কেবিনে আসে।

এমনি করে জাহাজের শেষ রাত্রি উপস্থিত হল। সে-রাত্রে খালাসীদের তৈরি গ্যালা-ব্যানকুয়েট খেয়ে যখন বাঙ্কে এ-পাশ ও-পাশ করছি, এমন সময় খালাসীদের মুরুব্বীটি আমার পায়ের কাছটায় পাটাতনে বসে হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর, একটি নিবেদন আছে।'

মোগলাই খানা খেয়ে তখন তবিয়ত বেজায় খুশ! মোগলাই কণ্ঠেই ফরমান জারি করলুম 'নির্ভয়ে কও।'

বললে, 'হুজুর, ইটা পরগনার ঢেউপাশা গাঁয়ের নাম শুনেছেন?'

আমি বললুম, 'আলবৎ! মনু গাঙ্গের পারে।'

বললে, 'আহা, হুজুর সব জানেন।'

মনে মনে বললুম, 'হায়, শুধু কাপ্তান আর খালাসীরাই বুঝতে পারল আমি কত বড় বিদ্যেসাগর! যারা বুঝতে পারলে আজ আমার পাওনাদারদের ভয় ঘুচে যেত তারা বুঝল না।'

বললে, 'সেই গ্রামের করীম মুহম্মদের কথাই আপনাকে বলতে এসেছি, হুজুর। করীম ব্যাটা মহা পাষণ্ড, চৌদ্দ বছর ধরে মার্সই (মার্সেলস) বন্দরে পড়ে আছে। ওদিকে বুড়ী মা কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি কানা করে ফেলেছে, কত খবর পাঠিয়েছে। হা— কিছুতেই দেশে ফিরবে না। চিঠিপত্রে কিছু হল না দেখে আমরা বন্দরে নেমে তার বাড়ি গিয়েছিলাম, তাকে বোঝাবার জন্য। ব্যাটার বউ এক বেঙথেকী, এমন তাড়া লাগালে যে, আমরা পাঁচজন মদ্দা মানুষ প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার পথ পাইনে। তবে শুনেছি, মেয়েমানুষটা প্রথম প্রথম নাকি তার ভাতারের দেশের লোককে

আদর-কদর কর্‌ত। যবে থেকে বুঝেছে, আমরা তাকে ভাওচি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার তালে আছি, সেই থেকে মারমুখো খাণ্ডার হয়ে আছে।'

আমি বললুম, 'তোমরা পাঁচজন লেঠেল যে-কর্মটি করতে পারলে না, আমি সেইটে পারব? আমাকে কি গামা পাহলওয়ান ঠাউরেছ?'

বললে, 'না, হুজুর, আপনাকে কিছু বলবে না। আপনি সুট টাই পরে গেলে ভাববে আপনি এসেছেন অন্য কাজে। আমাদের লুঙ্গি আর চেহারা দেখেই তো বেটী টের পেয়ে যায়, আমরা তার ভাতারের জাত-ভাই। আপনি হুজুর, মেহেরবানি করে "না" বলবেন না, আপনার যে কতখানি দয়ার শরীর সে-কথা বেবাক খালাসী জানে বলেই আমাকে তারা পাঠিয়েছে। আপনার জন্যই আজ আমরা ভাত—'

আমি বললুম, 'বাস্, বাস্, হয়েছে হয়েছে। কাপ্তান পাকড়ে নিয়ে শুধাল বলেই তো সব কথা বলতে হল। না হলে আমার দায় পড়েছিল।'

বললে, 'তওবা, তওবা। শুনলেও গুনা হয়। তা হুজুর, আপনি দয়া করে আর "না" বলবেন না। আমি বুড়ীর হয়ে আপনার পায়ে ধরছি।'

বলে সত্য-সত্যই আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। আমি 'হা হা কর কি' বলে পা দুটো ছাড়ালুম।

ওরা আমাকে যা কোর্মা-পোলাও খাইয়েছে তার বদলে এ-কাজটুকু না করে দিলে অত্যন্ত নেমকহারামি হয়। ওদিকে আবার এক ফরাসিনী দজ্জাল। ঝাঁটা কিংবা ভাঙা ছাতা নয়, পিস্তল হাতে নিয়ে তাড়া লাগানোই ওদের স্বভাব।

কোন্ মূর্খ বেরয় দেশভ্রমণে! কত না বাহান্ন রকমের যতসব

বিদ্‌কুটে, খুদার খামোখা গেরো!

বন্দরে নেমে দেখি, পরদিন ভোরের আগে বার্লিন যাবার সোজা ট্রেন নেই। ফাঁকি দিয়ে গেরোটা কাটাব তারও উপায় আর রইল না। দুজন খালাসী নেমেছিল সঙ্গে—ঢেউপাশার নাগরের বাড়ি দেখিয়ে দেবে বলে। তাদের পরনে লুঙ্গি, গায়ে রঙিন শার্ট, মাথায় খেজুর-পাতার টুপি, পায়ে বুট, আর গলায় লাল কম্ফর্টার। ওই কম্ফর্টারটি না থাকলে ওদের পোশাকী সজ্জাটি সম্পূর্ণ হয় না—বাঙালীর যে-রকম রেশমী উড়ুনি।

দুই হুজুরে আমাকে 'হুজুর' 'হুজুর' করতে করতে নিয়ে গেল বন্দরের এক সাবার্বে। সেখানে দূরের থেকে সন্তর্পণে ছোট্ট একটি ফুটফুটে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েই তাঁরা হাওয়া হয়ে গেলেন। আমি প্রমাদ গুনতে গুনতে এগলুম। পানির পীর বদর সায়েবকে এখন আর স্মরণ করে কোনও লাভ নেই। তাই সোঁদরবনের ডাঙার বাঘের পীর গাজী সাহেবের নাম মনে মনে জপতে লাগলুম—যাচ্ছি বাঘিনীরই সঙ্গে মোলাকাত করতে।

বেশ জোরেই বোতাম টিপলুম—চোরের মায়ের বড় গলা।

কে বলে খাণ্ডার? দরজা খুলে একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অতিশয় নিরীহ-চেহারার গো-বেচারী যুবতী এসে আমার সামনে দাঁড়াল। 'গো'-বেচারী বললুম তার কারণ আমাদের দেশটা গরুর। আসলে কিন্তু ওদের দেশের তুলনা দিয়ে বলতে হয়,'মেরি হ্যাড এ লিটল্ ল্যাম্ব'-এর ভেড়াটি যেন মেরির রূপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওদিকে আমি তৈরি ছিলুম পিস্তল, মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেডের জন্য। সামলে নিয়ে জাহাজে যে চোস্ত ফরাসিস আদব-কায়দার তালিম পেয়েছিলুম, তারই অনুকরণে মাথা নিচু করে বললুম 'আমি কি মাদার মা-ও-মের (মুহম্মদের ফরাসী উচ্চারণ)

সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ লাভ করছি?' ইচ্ছে করেই কোন্ দিশী লোক সেটা উল্লেখ করলুম না। ফরাসীরা চীনা, ভারতীয় এবং আরবীদের মধ্যে তফাত করতে পারেন না। আমরা যে-রকম চীনা, জাপানী এবং বর্মী সবাইকে একই রূপে দেখি।

চেহারা দেখে বুঝলুম মাদাম গুবলেট করে ফেলেছেন। বললেন, আঁত্রে (প্রবেশ করুন), মসিয়ো।'

ভরসা পেয়ে বললুম, 'মসিয়ো মাওমের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?'

'অবশ্য।'

ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি, শেখ করীম মুহম্মদ উত্তম ফরাসী সুট পরে টেবিলের উপর রকমারি নক্‌শার কাপড়ের ছোট ছোট টুকরোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ফরাসীতেই বললুম, 'আমি মাদ্রাজ থেকে এসেছি, কাল বার্লিন চলে যাব। ভাবলুম, আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই!' সে যে ভারতীয় এবং তার ঠিকানা জানলুম কি করে সে-কথা ইচ্ছা করেই তুললুম না।

ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে অভ্যর্থনা জানাল।

আমি ইচ্ছে করেই মাদামের সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিলুম। মার্সেলেস যে কী সুন্দর বন্দর, কত রকম-বেরকমের রেস্তোরাঁ-হোটেল, কত জাত-বেজাতের লোক কত শত রকমের বেশভূষা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আরও কত কী!

ইতিমধ্যে একটি ছেলে আর মেয়ে চীৎকার চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কী সুন্দর চেহারা! আমাদের করীম মুহম্মদ কিছু নটবরটি নন, তার বউও ফরাসী দেশের আর-পাঁচটা মেয়ের মত, কিন্তু বাচ্চা দুটির চেহারায় কী অপূর্ব লাবণ্য! কে বলবে এরা খাঁটি স্প্যানিশ

নয় ? সে দেশের চিত্রকরদের অয়েল পেন্টিঙে আমি এ-রকম দেব-শিশুর ছবি দেখেছি। ইচ্ছে করে, কোলে নিয়ে চুমো খাই। কিন্তু আশ্চর্য লাগল পূর্বেই বলেছি, বাপের চেহারা তো বাংলা দেশের আর-পাঁচজন হাল-চাষের শেখের যা হয় তা-ই, মায়ের সাধারণ চেহারাও ফরাসিনীর মত। তিন আর তিনে তা হলে সব সময় ছয় হয় না। দশও হতে পারে—ইনফিনিটি অর্থাৎ পরিপূর্ণতাও হতে পারে। প্রেমের ফল তা হলে অঙ্কশাস্ত্রের আইন মানে না।

মাদাম ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি তোদের বাবার দেশের লোক।' ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি আদর করতেই বলে উঠল, 'ল্যাঁদ, সে ত্যঁ প্যাই ফাঁতাস্তিক নেস্‌পা?'—অর্থাৎ ভারতবর্ষ ফেনটাসটিক দেশ, সে-দেশের অনেক ছবি সে দেখেছে, ভারি ইচ্ছে সেখানে যায়, কিন্তু বাবা রাজী হয় না—তুমি অঁকল (কাকা), আমাকে নিয়ে চল,' ওই ধরনের আরও কত কী!

আমি আবার প্রমাদ গুনলুম। কথাটা যে-দিকে মোড় নিচ্ছে তাতে না মাদাম পিস্তল বের করে।

অনুমান করতে কষ্ট হল না, আলোচনাটা মাদামের পক্ষেও অপ্রিয়। তিনি শুধালেন, 'মসিয়োর রুচি কিসে?—চা, কফি, শোকোলা (কোকো), কিংবা—'

আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

তবু শেষটায় কফি বানাতে উঠে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে করীম মুহম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে সিলেটী কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করতে গেল। বুঝলুম, ওর চোখ ঠিক ধরতে পেরেছে। আমি সিলিটীতেই বললুম, 'থাক্ থাক্।'

যে ভাবে তাকাল তার থেকে বুঝতে পারলুম, সে আমার পায়ের ধূলো নিতে যাচ্ছে না, সে পায়ের ধূলো নিচ্ছে তার দেশের

মুরুব্বীদের যাঁর ভিতর রয়েছেন আমার পিতৃ-পিতামহও, সে তার মাথায় ঠেকাচ্ছে দেশের মাটির ধুলো, তার মায়ের পায়ের ধুলো। আমি তখন বারণ করবার কে ? আমার কী দম্ভ! সে কি আমার পায়ের ধুলো নিচ্ছে ?

শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করলে, 'হুজুর কোন্ হোটেলে উঠেছেন ?' আমি নাম বললুম। স্টেশনের কাছেই।

আমি বললুম, 'বোস।' সে আপত্তি জানাল না। তারপর দুজনই আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

এমন সময়ে মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তার গালে চুমো খেয়ে বললুম, 'মধু।'

বাপ হেসে বললে, 'এবারে জন্মদিনে ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম ও কি সওগাত চায়, তখন চাইলে ইণ্ডিয়ান বর। আমাদের দেশের মেয়েরা বিয়ের কথা পাড়লেই ঘেমে ওঠে।'

তার গলায় ঈষৎ অনুযোগের আভাস পেয়ে আমি বললুম, 'মনে মনে নিশ্চয়ই পুলকিত হয়। আর আসলে তো এসব বাড়ির দেশের দশের আবহাওয়ার কথা। এরা পেটের অসুখের কথা বলতে লজ্জা পায়, আমরা তো পাইনে।'

ইতিমধ্যে কফি এল। মাদাম বললেন, 'মেয়ের নাম সারা (Sara, ইংরিজীতে Sarah), ছেলেটির নাম রোমাঁ।' বাপ বললে, 'আসলে রহমান।' বুঝলুম লোকটার বুদ্ধি আছে। 'সারা' নাম মুসলমান মেয়েদেরও হয়। আর রহমানের উচ্চারণ ফরাসীতে মোটামুটি রোমাঁই।

বেচারী মাদাম। কফির সঙ্গে দিলে দুনিয়ার যত রকমের কেক, পেসট্রে, গাতো, ব্রিয়োশ, ক্রোয়াসাঁ। বুঝলুম, পাড়ার দোকানের যাবতীয় চায়ের আনুষঙ্গিক ঝেঁটিয়ে কিনে আনিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, পেঁয়াজের ফুলুরিও। মাদাম বললে, 'ম মারি—ইল লেজ

এম।' আমার স্বামী এগুলো ভালবাসেন।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মামি'—আমিও মা।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মনোঁকল' —আমিও চাচা।

আমি আর সইতে পারলুম না। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সে-সম্বন্ধে আমি সমস্তক্ষণ সচেতন ছিলুম। রোমাঁর ভারত যাওয়ার ইচ্ছে, সারার ভারতীয় বরের কামনা এসব আমায় যথেষ্ট কাবু করে এনেছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সেরা সেরা মিষ্টির কাছের ফুলুরির প্রশংসা —এ কোন্ দেশের রক্ত চেঁচিয়ে উঠে আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে?

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'আজ তবে আসি। বার্লিনের টিকিট আমার এখনও কাটা হয়নি। সেটা শেষ না করে মনে শান্তি পাচ্ছিনে।'

সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল। ছেলেটা বললে, 'কিন্তু আপনি তো এখনও আমাদের অ্যালবাম দেখেননি!' বলেই কারও তোয়াক্কা না করে অ্যালবাম এনে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল। 'এই ত বাজান (বাবা+জান, সিলেটীতে বাজান), কী অদ্ভুত বেশে এদেশে নেমেছিলেন, এটার নাম লুঙ্গি, না বাজান? কিন্তু ভারি সুন্দর, আমায় একটা দেবে, অঁক্‌ল্—চাচা? বাবারটা আমার হয় না, (মাদাম বললেন, 'চুপ', ছেলেটা বললে 'পার্দোঁ' অর্থাৎ বে-আদবি মাফ কর) এটা মা, বিয়ের আগে, ক্যাল এ জলি, কী সুন্দর—'

ওঃ!

গুষ্টিসুদ্ধ আমাকে ট্রামটার্মিনাসে পৌঁছে দিতে এল। পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বমহল্লা থেকে অন্তত একটা ট্রাম যায়—বিনা চেঞ্জে—স্টেশন অবধি। বিদেশীকে সেই ট্রামে বসিয়ে দিলেই হল। মাদাম

কিন্তু তবু পই পই করে কণ্ডাক্টরকে বোঝালেন, আমাকে যেন ঠিক স্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হয়। 'মসিয়ো এ (ত) এত্রাজেঁর, স্ট্রেঞ্জার, বিদেশী, (তারপর ফিস্ ফিস্ করে) ফরাসী বলতে পারেন না—'

মনে মনে বড় আরাম বোধ করলুম। যাক্, তবু একটি বুদ্ধিমতী পাওয়া গেল, যে আমার ফরাসী বিদ্যের চৌহদ্দি ধরতে পেরেছে।

মাদাম, কাচ্চাবাচ্চারা চেঁচালে, 'ও রভোয়ার।'

করীম মুহম্মদ বললে, 'সেলাম সায়েব।'

আহারাদির পর হোটেলের লাউঞ্জে বসে উপরে ঘুমুতে যাব-যাচ্ছি যাব-যাচ্ছি করছি, এমন সময় করীম মুহম্মদ এসে উপস্থিত। পরনে লুঙ্গি কম্ফর্টার।

ইউরোপের কোনও হোটেলে ঢুকে আপনি যদি লাউঞ্জে জুতো খুলতে আরম্ভ করেন, তবে ম্যানেজার পুলিশ কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে। ভাববে আপনি খেপে গেছেন। এ-তত্ত্বটি নিশ্চয়ই করীমের জানা; তাই তার সাহস দেখে অবাক মানলুম। বরঞ্চ আমিই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে বারণ করলুম। কিন্তু তারপর বিপদ, সে চেয়ারে বসতে চায় না। বুঝতে পারলুম, পরিবারের বাইরে এসে সে ঢেউপাশার 'কেরীম্যা' হয়ে গিয়েছে। জুতো পরবে না, চেয়ারে বসবে না, কথায় কথায় কদম্‌বোস্ পদচুম্বন —করতে চায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'এ কী আপদ!'

লজ্জা পেয়ে বললে, 'হুজুরের বোধ হয় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে সকলের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে! তা হলে, দয়া করে, আপনার কামরায়—'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, 'আদপেই না।' এবং এ অবস্থায় শ্রীহট্টের প্রত্যেক সুসন্তান যা বলে থাকে, সেটাও জুড়ে

দিলুম, 'আমি কি এ ঘরে "মাগনা" বসেছি, না, এদের জমিদারীর প্রজা! কিন্তু তুমি এ-রকম করছ কেন? তুমি কি আমার কেনা গোলাম নাকি? চল উপরে।'

সেখানে মেঝেতে বসে একগাল হেসে বললে, 'কেনা গোলাম না তো কি? আমার চাচাতো ভাই আছমত ছিল আপনাদের বাসার চাকর। এখনও আমি মাকে যখন টাকা পাঠাই সেটা যায় আপনার সাহেবের (পিতার) নামে। আমি আপনাদের বাসায় গিয়েছি, আপনার আম্মা আমাকে চীনের বাসনে খেতে দিতেন, আমি আপনাকে চিনি হুজুর।'

আমি শুধালুম, 'বউকে ফাঁকি দিয়ে এসেছ?'

বলল, 'না, হুজুর। খেতে বসে রোমাঁর মা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললে। আপনাকে যে রাত্রে খেতে বলতে পারেনি তার জন্যে দুঃখ করলে। ও সত্যি বললে যে আপনাতে আমাতে বাড়িতে নিরিবিলি কথাবার্তা হবে না, তাই আপনাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেনি। আসবার সময় বললে, "উনি যা বলেন তাই হবে!"

আমি শুধালুম, 'বউ না বললে তুমি আসতে না?'

কিছুমাত্র না ভেবে বললে, 'নিশ্চয়ই আসতুম। তবে ওকে খামকা কষ্ট দিতে চাইনে বলে না-বলে আসতুম। বলে লাজুক বাচ্চাটির মত ঘাড় ফেরালে! আমার বড় ভাল লাগল।

আমি শুধালুম, 'আমি তোমাদের বাড়িতে কি বলতে গিয়েছিলুম তোমরা জানলে কি করে? আর আমি শুনেছি, তোমার বউ দেশের লোককে তাড়া লাগায়? আমাকে লাগাল না কেন?'

যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'তা একটু-আধটু লাগায় বটে, হুজুর, ওরা যে বলে বেড়ায় আমাকে রোমাঁর মা ভেড়া বানিয়ে রেখেছে সে খবরটা ওর কানে পৌঁছেছে। তাই গেছে সে ভীষণ

চটে। আসলে ও বড় শান্তপ্রকৃতির মেয়ে, ঝগড়া-কাজিয়া কারে কয় আদপেই জানে না।

'আর মানুষকে কি কখনও ভেড়া বানানো যায়? কামরূপে না, কোনখানেই না।

'আপনি তা হলে সব-কিছু শুনে বিবেচনা করুন, হুজুর।

'সতেরো বছর বয়সে আমি আর-পাঁচজন খালাসীর সঙ্গে নামি এই বন্দরে। কেন জানিনে, হুজুর, হঠাৎ পুলিশ লাগালে তাড়া। যে যার জান নিয়ে যেদিকে পারে দিলে ছুট। আমি ছিটকে পড়লাম শহরের এক অজানা কোণে। জাহাজ আর খুঁজে পাইনে। শীতের রাতে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় এক পোলের নীচে শুয়ে পড়লাম জিরব বলে। যখন হুঁশ হল তখন দেখি, আমি এক হাসপাতালে শুয়ে। জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে—দেশে আমার ম্যালেরিয়া হত। তারপর কদিন কাটল হুঁশে আর বেহুঁশে তার হিসেব আমি রাখতে পারিনি। মাঝে মাঝে আবছা আবছা দেখতে পেতাম, ডাক্তারেরা কি সব বলাবলি করছে। সেরে উঠে পরে শুনতে পাই ওদের কেউই কখনও ম্যালেরিয়া রোগীর কড়া জ্বর দেখেনি বলে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। আর জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম একটি নার্সকে। সে আমায় জল খাইয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের দুদিক মুছে দিত! একদিন শেষরাতে কম্প দিয়ে এল আমার ভীষণ জ্বর। নার্স সব কখানা কম্বল চাপা দিয়ে যখন কম্প থামাতে পারল না তখন নিজে আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। দেশে মা যে-রকম জড়িয়ে ধরত ঠিক সেই রকম। তারপর আমি ফের বেহুঁশ।

'কিন্তু এর পর যখন জ্বর ছাড়ল, তখন আমি ভাল হতে লাগলাম। শুয়ে শুয়ে দেশের কথা, মায়ের কথা ভাবি আর ওই নার্সটিকে দেখলেই আমার জানটা খুশিতে ভরে উঠত। সে মাঝে মাঝে আমার

কপালে হাত বুলিয়ে দিত আর ওদের ভাষায় প্রতিবারে একই কথা বলত। আমি না বুঝেও বুঝতাম, বলছে, "ভয় নেই, সেরে উঠবে।"

'তারপর একদিন ছাড়া পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বন্দরের দিকে। সেখানে এক জাত-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। অন্য এক জাহাজের—আমাদের জাহাজ তো কবে ছেড়ে দিয়েছে। সে সব কথা শুনে বললে, "ভাগো ভাগো, এখুনি ভাগো। তোমার নামে হুলিয়া জারি হয়েছে, তুমি জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছো। ধরতে পারলেই তোমাকে পুলিস জেলে দেবে।"

'ক বছর? কে জানে! এক হতে পারে চোদ্দও হতে পারে। আইন-কানুন হুজুর আমি তো কিছুই জানিনে।

'কিন্তু যাই-ই বা কোথায়? যে-দিকে তাকাই সে-দিকেই দেখি পুলিস।

'খানা-পিনার কথা তুলব না, হুজুর, সে তখন মাথায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু রাতটা কাটাই কোথায়?

'শেষটায় শেষ অগতির গতির কথা মনে পড়ল। হাসপাতাল ছাড়ার সময় সেই নার্সটি আমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে দিয়েছিল একখানা চিরকুট। তখনও জানতাম না, তাতে কী লেখা। যাকে দেখাই সে-ই হাত দিয়ে বোঝায়—আরও উত্তর দিকে যাও। শেষটায় একজন লোক আমাকে একটা বড় বাড়ির দেউড়ি দেখিয়ে চলে গেল।

'সেখানে ঘণ্টাতিনেক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রোঁদের পুলিস আমাকে সওয়াল করতে লাগল। হাসপাতালে ছ মাস ওদের বুলি শুনে শুনে যেটুকু শিখেছিলাম তার থেকে আন্দাজ করতে পারলাম, ওর মনে সন্দেহ হয়েছে, আমি কি মতলবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি—আর হবেই বা না কেন? বুঝলাম, রাশিতে জেল আছেই। মনে

মনে বললাম, কী আর করি, একটা আশ্রয় তো চাই। জেলই কবুল। চাচা মামু অনেকেই তো লাঠালাঠি করে গেছেন, আমি না হয় না-করেই গেলাম।

'এমন সময় সেই নার্সটি এসে হাজির। পুলিসকে কি একটা সামান্য কথা বলে আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল তার ছোট্ট ফ্ল্যাটে— পুলিস যেভাবে তাকে সেলাম করে রাঁটি না কেড়ে চলে গেল তার থেকে আন্দেশা করলাম পাড়ার লোক ওকে মানে।

আমাকে খেতে দিল গরম দুধের সঙ্গে কাঁচা আণ্ডা ফেটে নিয়ে। বেহুঁশির ওক্তে কি খেয়েছি জানিনে, হুজুর, কিন্তু হুঁশের পর দাওয়াই হিসেবেও আমি শরাব খাইনি। তাই 'বরাণ্ডি'টা বাদ দিল।

'রাতে খেতে দিল রুটি আর মাংসের হালকা ঝোল। চারটি ভাতের জন্য আমার জান তখন কী আকুলি-বিকুলি করেছিল আপনাকে কখনও সমঝাতে পারব না, হুজুর।'

জাহাজের খালাসীদের স্মরণে আমি মনে মনে বললুম, 'সমঝাতে হবে না।' বাইরে বললুম, 'তারপর?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে, 'সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে, সায়েব। আর কী-ই বা হবে বলে! ও আমাকে খাওয়ালে পরালে আশ্রয় দিলে বিদেশে-বিভুঁইয়ে যেখানে আমার জেলে গিয়ে পাথর ভাঙার কথা—এ সব কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে না বললে কি তার দাম কমে যাবে!

'দাম কমবে না বলেই বলছি হুজুর, সুজন নার্সের কাম করে—'

আমি শুধালুম, 'কি নাম বললে?'

একটু লজ্জা পেয়ে বললে, 'আমি ওকে সুজন বলে ডাকি—ওদের ভাষায় সুজান।'

বুঝলুম ওটা ফরাসী Suzzanne, এবং আরও বুঝলুম, যে-জাতের

• লোক আমাদের দেশের মরমিয়া ভাটিয়ালী রয়েছে তাদেরই এক-জনের পক্ষে নামের এটুকু পরিবর্তন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিছু কঠিন কর্ম নয়। অতখানি স্পর্শকাতরতা এবং কল্পনাশক্তি ওদের আছে।

আমি শুধালুম, 'তারপর কি বলছিলে?'

বললে, 'সুজন নার্সের কাম করে আমাকে যে এক বছর পুষেছিল তখন আমি তার বাড়ির কাজ করেছি। বেচারীকে নিজের রান্না নিজেকেই করতে হত—হাসপাতাল থেকে গতর খাটিয়ে ফিরে আসার পর। আমি পাক-রসুই করে রাখতাম। শেষ দিন পর্যন্ত সে আপত্তি করেছে, কিন্তু আমি কান দিইনি <।'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু তোমার পাড়ার পুলিস কিছু গোলমাল করলে না?'

একটুখানি মাথা নীচু করে বললে, 'অন্য দেশের কথা জানিনে, হুজুর। কিন্তু এখানে মহব্বতের ব্যাপারে এরা কোন রকম বাগড়া দিতে চায় না। আর এরা জানত যে, ওর বাড়িতে ওঠার এক মাস পরে ওকে আমি বিয়ে করি।

'কিন্তু হুজুর আমার বড় শরম বোধ হত; এ যে ঘর-জামাই হয়ে থাকার চেয়েও খারাপ! কিন্তু করিই বা কী?

'আল্লাই পথ দেখিয়ে দিলেন।

'সুজন আমাকে ছুটি-ছাটার দিনে সিনেমা-টিনেমায় নিয়ে যেত। একদিন নিয়ে গেল এক মস্তবড় মেলাতে। সেখানে একটা ঘরে দেখি, নানা দেশের নানা রকম তাঁত জড় করে লোকজনকে দেখানো হচ্ছে তাঁতগুলো কি করে চালানো হয়, সেগুলো থেকে কি কি নক্শার কাপড় বেরোয়। তারই ভিতর একটা দেখতে পেলাম, অনেকটা আমাদের দেশেরই তাঁতের মত।

'আমার বাপ-ঠাকুরদা জোলার কাজ করেছে, ফসল ফলিয়েছে,

দরকার হলে লাঠিও চালিয়েছে।

'অনেক ইতি-উতি কিন্তু-কিন্তু করে সুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাঁতের দাম কত?' বুঝতে পারল, ওতে আমার শখ হয়েছে। ভারী খুশী হল কারণ আমি কখনও কোন জিনিস তার কাছ থেকে চাইনি। বললে, ওটা বিক্রির নয়, কিন্তু মিস্ত্রী দিয়ে আমাকে একটা গড়িয়ে দেবে।

'ও দেশে ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি গামছা কিনবে কে? আমি বানালাম স্কার্ফ, কম্ফর্টার। দিশী নক্শায়। প্রথম নক্শার আধখানা ফুটতে-না-ফুটতেই সুজনের কী আনন্দ! স্কার্ফ তাঁত থেকে নামাবার পূর্বেই সে পাড়ার লোক জড় করে বসেছে, আজগুবি এক নূতন জিনিস দেখাবে বলে। সবাই পই পই করে দেখলে, অনেক তারিফ করলে। সুজনের ডবল আনন্দ, তার স্বামী নিষ্কর্মা, ভবঘুরে নয়। একটা হুনুরী, গুণী লোক।

'গোড়ার দিকে পাড়াতে, পরে এখানে-সেখানে বিস্তর স্কার্ফ বিক্রি হল। বেশ দু-পয়সা আসতে লাগল। তারপর এখানকার এক তাঁতীর কাছে দেখে এলাম কী করে রেশমের আর পশমের কাজ করতে হয়। শেষটায় সুজন নিয়ে এল আমার জন্য বহুত কেতাব, সেগুলোতে শুধু কাশ্মীরী নক্শা নয়, আরও বহুত দেশের বহুত রকম-বেরকমের নক্শাও আছে। তখন যা পয়সা আসতে লাগল তারপর আর সুজনের চাকরি না করলেও চলে। সেই কথা বলতে সে খুশীর সঙ্গে রাজী হল। শুধু বললে, যদি কখনও দরকার হয় তবে আবার হাসপাতালে ফিরে যেতে পারবে। রোমাঁ তখন পেটে। সুজন সংসার সাজাবার জন্য তৈরী।

'আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কেন বুড়ীর কথা পাড়ছিনে। বলছি, হুজুর, রাতও অনেক ঘনিয়ে এসেছে, আপনি আরাম করবেন।

'আপনি বিশ্বাস করবেন না দু-পয়সা হতেই সুজন বললে, "তোমার মাকে কিছু পাঠাবে না?" আমি আগের থেকেই বন্দরে ইমানদার লোক খুঁজছিলাম। রোমাঁর মা-ই বললে, ব্যাঙ্ক দিয়েও নাকি দেশে টাকা পাঠানো যায়।

'মাসে মাসে বুড়ীকে টাকা পাঠাই। কখনও পঞ্চাশ কখনও এক শো। ঢেউপাশাতে পঞ্চাশ টাকা অনেক টাকা। শুনি বুড়ী টাকা দিয়ে গাঁয়ের জন্য জুম্মা-ঘর বানিয়ে দিয়েছে। খেতে পরতে তো পারছেই।

'টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয়, দেশে বলে টাকার নাম জয়রাম, টাকা হইলে সকল কাম—কিন্তু হুজুর, টাকা দিয়ে চোখের পানি বন্ধ করা যায় না। এ-কথা আমি খুব ভাল করেই জানি। বুড়ীও বলে পাঠিয়েছে, টাকার তার দরকার নেই, আমি যেন দেশে ফিরে যাই।

'আমার মাথায় বাজ পড়ল, সায়েব, যেদিন খবর নিয়ে শুনলাম, দেশে ফিরে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু ফিরে আসা অসম্ভব। আমি এখন আমার মহল্লার মুরুব্বীদের একজন। থানার পুলিসের সঙ্গেও আমার বহুত ভাব-সাব হয়েছে। আমার বাড়িতে প্রায়ই তারা দাওয়াত-ফাওয়াত খায়। তারা প্যারিস থেকে পাকা খবর আনিয়েছে, ফিরে আসা অসম্ভব। মুসাফির হয়ে কিংবা খালাসী সেজে পালিয়ে এলেও প্যারিসের পুলিস এসে ধরে নিয়ে দেশে চালান দেবে। এমন কি, তারা আমাকে বারণ করেছে আমি যেন ওই নিয়ে বেশী নাড়া-চাড়া না করি। প্যারিসের পুলিস যদি জেনে যায় আমি বিনা পাসপোর্টে এ দেশে আছি তা হলে তারা আমাকে মহল্লার পুলিসের কদর দেখাবে না। এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আপনি কি বলেন, হুজুর?'

তাহা মিথ্যে বলি কি প্রকারে? আমার বিলক্ষণ জানা ছিল,

ফ্রান্স চায় টুরিস্ট সে দেশে এসে আপন গাঁটের পয়সা খরচ করুক, কিন্তু তার বেকারির বাজারে কেউ এসে পয়সা কামাক এ-অবস্থাটা সে যে করেই হোক রুখবে।

আমি চুপ করে রইলুম দেখে করীম মোহাম্মদ মাথা নীচু করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে বললে, 'রোমাঁর মা আমার মনের সব কথা জানে। দেশের লোক ভাঙচি দেয়, আমি ভেড়া বনে গিয়েছি এ-কথা বলে—এ-সব শুনে সে তাদের পছন্দ করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভোরের ঘুম ভেঙে গেলে দেখি সেও জেগে আছে। তখন আমার কপালে হাত দিয়ে বলে, "তোমার দেশে যদি যেতে ইচ্ছে করে তবে যাও। আমি একাই বাচ্চা দুটোকে সামলাতে পারব।" এ-সব আরম্ভ হল, ও নিজে মা হওয়ার পরের থেকে।

'আজ আপনার কথা তুলে বললে, "এ-ভদ্রলোকের শরীরে দয়ামায়া আছে। আমার ছেলেমেয়েকে কত আদর করলেন।" আমি বললাম, "সুজন, তুই জানিসনে, আমাদের দেশের ভদ্রলোক আমাদের কত আপনজন। এই যে ভদ্রলোক এলেন, এঁর সায়েব (পিতা) আমার বাবাকে "পুতী" (ছেলে) বলে ডাকতেন। এ দেশের ভদ্রলোক তো গরীবের সঙ্গে কথা কয় না।" আপনি-ই বলুন, হুজুর।'

তার 'আপনজন'! ওইটুকুই বাকি ছিল!

'সুজনই আজ বললে, "ওঁর কাছে গিয়ে তুমি হুকুম নাও। উনি যা বলেন তাই হবে।" এইবার আপনি হুকুম দিন, হুজুর।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'তুমি আমায় মাফ কর।'

সে আমার পায়ে ধরে বললে, 'আপনার বাপ-দাদা আমার বাপ-দাদাকে বিপদে-আপদে সলা দিয়ে হুকুম করে বাঁচিয়েছেন। আজ আপনি আমায় হুকুম দিন।'

আমি নির্লজ্জের মত পূর্ব-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বললুম, 'তুমি আমায় মাফ কর।'

অনেক কান্নাকাটি করল। আমি নীরব।

শেষরাত্রে আমার পায়ে চুমো খেল। আমি বাধা দিলুম না। বিদায় নিয়ে বেরবার সময় দোরের গোড়ায় তার বুক থেকে বেরল, 'ইয়া আল্লা!'

॥ গাঁজা ॥

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' জাতীয় কোনো উপাধিই দিলেন না, এবং শেষ পর্যন্ত শিশির ভাদুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মতো ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রকফেলাররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রকফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলম্গীর' উপাধি দিলেন!

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত, এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা শুঁড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কি করি বলুন তো।'

মশাদার এরকম সকরুণ বেদনার গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি এর পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যেদিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত; অর্থাৎ দু চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফণি-কাকার বয়স যাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয়নি। এরা মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল প্যাঁচ। অজন সেনকে বললে, 'অজনদা, আমার আপিসকে ঝপ্ করে একটা ফোন্ করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁচেছি কিনা।'

অজনদা আরো তৈরী মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কি একটা শুনে আঁতকে উঠে বললে, 'কী বললেন? পৌঁছয়নি? বলেন কি মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো!'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনো ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্তমনে সমাহিত চিত্তে কর্তব্য কর্মে মন দিলুম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলম্‌গীর।'

আমি বললুম, 'হাসালি রে হাসালি। এ আর নূতন কি শোনালি? প্রথম আমি পরীস্তানে ছিলুম গুল্-ই-বকাওলী, তারপর লণ্ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালো, ভালো। গুলম্‌গীর। বেশ বেশ।'

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন ক্বচিৎ-কস্মিন। বললেন 'ল্যাটে—ল্যাটে বুঝলেন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান এক ফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে, স্বর্গের দিকে ঠোঁট দুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে 'ত', 'দ'-কে 'ট', 'ড' করে কথা বলেন—অল্পই।

তাঁর এসব কলকায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বললে, 'এবারে আপনি আপনার উপাধি-প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা।'

মশা বললে, 'কিংবা গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল ?'

ঘেন্টু বললে, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবিনে রে, ছেড়ে দে।' ঘেন্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘণ্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেন্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেন্টু চর্মরোগের জাগ্রতা দেবী। বিশ্বেস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনো সোসিয়ো-পোলিটিকো-ইকনমিক স্টাটিস্‌টিক্‌স্ সঞ্চয় না করে।' সে আজ কাল ঐ নিয়ে মেতেছে।

টেটেন নানাবটি কেস পড়ছিল। বললে, 'আপনি কিস্‌সুটি জানেন না চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্টাটিস্‌টিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্য—কাগজে দেখতে পান ? আমি আপনার দোরে যাব কেন ?'

'তবে শোন্। নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।

পার্টিশনের বছর খানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওতর বাংলার কোথায় যেন কি একটা ডাঙর নোকরি করে। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনো ঝগড়া-কাজিয়া নেই।

এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহরুজী আর আইয়ুব খান সায়েব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ-বুদ্ধি এক্কেয়ার করেছেন। তা সে যাকগে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধলে, "তোদের দেশে গাঁজার কি পরিস্থিতি?"

আমি একগাল হেসে বললুম, "স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।"

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধালে "সে কিরে? কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছিনে।"

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল দাদা ছিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কি করে জানবো? আমি পাষণ্ড বটি,—দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

দাদা বললে, "শোন।

পার্টিশনের ফলে মেলা অচিন্তিত প্রশ্ন, নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়ালো গঞ্জিকা-সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজ্‌কই-জাহাঁগীরীতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি সস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাদের রাজসিক জাত্যভিমানে। সে কথা যাক্।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এসব তত্ত্ব জানতুম না—সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি। এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিলে, সে বচ্ছরের গাঁজা গুদোমে

পচে বরবাদ হব হব করছে। ইণ্ডিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই—অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।"

আমি শুধালুম, "কেন? তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জুলুম!"

দাদা বললে, "কী জ্বালা! আমি শ্রীঘরবাস পছন্দ করিনে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইল্ড প্রডিজি—ওয়াণ্ডার চাইল্ড—চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞানগম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।"

আমি চটে গিয়ে বললুম, "আর তুমি বিয়াল্লিশে।"—দাদা আমার চেয়ে দু'বছরের বড়।

দাদা বললে, "তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।"

রক্‌ফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার ইন্‌সিডেন্ট আমাদের ভিতরে কালে-কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় 'আকাশ-বাণী,' 'ঢক্কা-ডিংডমে' পৌঁছবার পূর্বেই।'

অজনদা শুধোলে, 'ঢক্কা-ডিংডম্‌টা কি চাচা?'

'ডিংডম্' মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজী 'টম্‌টম্,' 'টমটমিং' শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র। তারপর শোন,

দাদা বললে, "ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ভারতের যাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্ম-চিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে—"

আমি গোশ্‌শা করে বললুম, "দেখো দাদা, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মস্করা করো—"

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বললে, "দেখ ভাই, তুই কখনো দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—"

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, "থাক থাক। তুমি বলো।" দাদার ঐ গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরী। চশমার পরকলা দুটো পুছে নিয়ে বললে, "পূর্বেই বলেছি, পার্টিশনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল—এটা তারই একটা। পার্টিশনের পূর্বে সান্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্লেশে, ব্যাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালো এক দুশমন্। জিনীভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে—কল্যাণ না কচু—তার সার মর্ম এই; আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশী করতে পারো, যত খুশী ততো আফিঙ ফলিয়ে বিক্রি করতে পারো, গাঁজা চালাতে পারো, —কিন্তু ভুলো না, আপন দেশের চৌহদ্দীর ভিতর। এক্স্পোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন জিনীভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যাণ্ড জিনীভার মারফতে তোদের কাছে চাইলে দু' মণ আফিঙ—ওষুধ বানাবার জন্য। জিনীভা সন্দেহের গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্যে, সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যাণ্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরি খানিকটে আক্রা দরে বাজারে বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিঙখোর বানিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনো কোনো দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ বানানেওলাদের সঙ্গে সড় করে ওষুধের অছিলায় বেশী বেশী হশীশ, ককেইন রপ্তানি করে সে সব দেশের বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখিনি, তাই ঠিক ঠিক বলতে পারবো না—নির্যাসটি জানিয়েছিল, গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার।

এখন নাকি জিনীভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সঙ্কট।

গেল বছরের গাঁজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরী। তুলে গুদোমজাত করতে হবে। নূতন গুদোম এক ঝটকায় তৈরী করা যায় না—শেষটায় হয়তো জিনীভা কোনো পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল, "গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—"

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই—টেটেনদি ছাড়া—এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠলো। খাই আর না-ই খাই একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়? রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্‌স্‌ পাদ্রীকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্‌টিশিয়ান টেটেন বললে, 'আপনারা এতে এমন কি নূতন শোক পাচ্ছেন? মাকিনরা যে দু'দিন অন্তর অন্তর অঢেল গম লিট্‌রিলি অ্যাণ্ড মেট্‌ফরিক্লি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরিজীতে এম-এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলবার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগারেট ধরিয়ে বললুম, 'তারপর দাদা বললে' 'গুদোমেতে নূতন মাল পোরা হবে। ম্যানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাবো, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে—তুই জানিস নাকি?—বড়দা তোকে

বলেছেন, তিনি যখন জাপানী বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন হুকুম এল, জাপানী বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ কারেন্‌সি নোট পুড়িয়ে ফেলবে ? ভাইজাগ না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটি মাত্র বোমা পড়া মাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর দু'বছর বাদে, তাজ্জবকী বাৎ, বাজারে সে সব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায়নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ঐ যদি না হয়।

আগে-ভাগে দিনক্ষণ দেখে, অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরলুম গাঁজা পোড়াতে।"

আমি আঁতকে উঠে বললুম, "কি বললে ?"

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বললে "হ্যাঁ তাতো বটেই। 'গাঁজা পোড়ানো' কথাটার অর্থ 'গাঁজা খাওয়া'ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগরেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বললেন, 'জানিস, সিগরেট মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু'। সে তখন শান্তকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাইতো ওকে পোড়াতে যাচ্ছি।'

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমনকি তফাৎ যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে ? তা সে যাকগে।

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যিখানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করলে। সে-ই তার জনক—একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায়, ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড! পাতা পোড়াবার সময় যেদিকে ধুঁয়ো যায় মানুষ সেদিক থেকে সরে যায়। আজ দেখি উল্টী বাৎ। জোয়ান-বুড়ো মেয়েমদ্দে—হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়েছেলেও ছিল—ছোটে সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর! সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই—অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস—'আঃ, আঃ'! কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে দু'হাত রেখে, আকাশের দিকে আকর্ণব্যাদান মুখ তুলে নাসা-রন্ধ্র স্ফীত করে নিচ্ছে এক একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আঃ—!' শব্দ। কেউ বা মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মতো মুখ হাঁ করে আস্য মার্গ দিয়ে যৌগিক-ধূম গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটালো। তখন পড়িমড়ি হয়ে সবাই ছুটলো সেদিকে। আমি, ম্যানেজার, সেরেশ্তাদার ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্যদিকে। দু'একটি চাপরাশী দেখি মনস্থির করতে পারছে না। তাদের আমি দোষ দিইনে।

ভেবে দেখ্, পৃথিবীতে এ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও ফলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ। চতুর্দিকে গরীব দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস টৈটম্বুর করে। হয়ত ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনো এক

ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে? আমি তার ট্রেলার বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না। ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করছে মালের জন্য হুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিরগা-জলসার-জনসমাজ দিকনির্ণয় যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলছে—ধুঁয়ো যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'জাগ্রত ভগবানকে' ডেকেছিলেন তাঁকে 'জনসমাজ-মাঝে,' ডেকে নেবার জন্যে? আমি পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে—আল্লাতালা যেন এই আমামুন্নাস, এই 'জনসমাজ' থেকে আমাকে তফাত রাখেন।"

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতির লোক, চোখেমুখে কোনো রকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য দরদী লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদুহাস্য দেখা যায়—যা-ই হোক, যা-ই থাক, আমার মতো ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কি টুপি পরা সেই লোক খনে এদিক খনে ওদিক ধাওয়া করছে, টুপির ফুন্না বা ট্যাসেল চৈতনের মতো খাড়া হয়ে এদিক ওদিক কম্পমান—এ দৃশ্যের কল্পনা মাত্রই বাস্তবের বাড়া।

দাদা বললে, "তুই তো হাসছিস। আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম্ মাজ্জিম্ করতে আরম্ভ করেছে। এত হুটোপুটি সত্ত্বেও ঘিলুতে খানিকটে ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কি রকম যেন চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব। তারপর দেখি, ম্যানেজারটা আমার দিকে চেয়ে কি রকম বেয়াদবের মতো ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

আর এ-স্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জীপে উঠলুম। সেও এক বিপদ। দেখি দু-খানা জীপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবহু একই রকম। কোনটায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মতো কে একজন দাঁড়িয়ে। হুবহু আমারই মতো, তার টুপির ফুন্নাটি পর্যন্ত। দুজনাতে দুই জীপে উঠলুম।"

আমি বললুম, 'দুটো জীপ না কচু!'

দাদা বললে, "বুঝেছি, বুঝেছি, তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন। তারপর গাড়ি যায় কখনো ডাইনে ঢাকা, আর কখনো বাঁয়ে মতিহারী। তবে কি ড্রাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমারই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্য জীপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জীপ। সেও না হয় বুঝলুম। কিন্তু তারপর, মোশয়, সে কী কাণ্ড! চারখানাই উড়তে আরম্ভ করল।"

আমি শুধালুম, 'উড়তে?'

"হ্যাঁ' উড়তে। জীপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশী।

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলোয় পৌঁছলুম।

ভাগ্যিস বেশী ধুঁয়ো মগজে যায়নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। বাপ্‌স্‌। তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে—কিন্তু কী কাঠিন্য কী দার্ঢ্য সে কণ্ঠে—শুধালেন, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?' আমি কিছু বলিনি।"

দাদা থামলেন।

আমি আড্ডাকে বললুম, 'আমার ভাবী সাহেবা অতিশয়

পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবী টপকান। শমস্থল্-উলেমার মেয়ে।'

রক শুধালে, 'ওটার মানে কি চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর! তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট্ নাম্বার।'

রক শুধালে, 'তারপর?'

আমি বললুম, 'তদনন্তর কি হল জানিনে। বৌদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারিনে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাবী সায়েবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপরতী পরোটা ও দেখতে বজ্রের মতো কঠোর খেতে কুসুমের মতো মোলায়েম শব্ডেগ্ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি অনাহারে মারা গেল।

মশাদা বললে, 'বিলকুল্ গুল্।'

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, 'সাকুল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাঁজার গুল।

অর্থাৎ গুলের রাজা গুলমগীর। তোরা আমাকে আজ ঐ টাইটিলটি দিলি না?

ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী)

বার্লিন শহরে উলাণ্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুস্থান হৌস' নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা—বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান —আর চেলারা গোঁসাই, মুখুয্যে, সরকার, রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক'জন।

চাচার ন্যাওটা শিষ্য গোঁসাই বললেন, 'যা বলো, যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কিরকম যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের—না, হ্যাশের—খবর কি? কি খেলেন, কি দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।'

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, কি খেলুম? কই মাছ—এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ; ইলিশ মাছ—এক-একটা তিমি মাছের সাইজ; আর তিমি মাছ—তা সে দেখেনি। তবে বোধ হয়, তাবৎ বাকরগঞ্জ ডিস্‌টিক্‌টাই তারই একটার পিঠের উপর ভাসছে। ঐ যেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চর ভেবে তারই পিঠের উপর রশুই চড়িয়েছিল।'

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সকলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে। দুটি জর্মন চ্যাংড়া একটি চিংড়িকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রান্নার ঝালের দাপটে জর্মনরা সচরাচর হিন্দুস্থান হৌসে আসতো না। পাড়ার জর্মনরা তো আমাদের লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধের ডিসপোজেলের গ্যাস-মাস্‌ক পরতো। তবে দু'একজন যে একেবারেই আসত না তা নয়—'ইণ্ডিশে রাইস-কুরি'

অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল-ভাতের খুশবাই জর্মনি হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতোভাবে ওদের উপর একটা নজর বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'খাইছে! আবার সে ইটারনেল্ ট্রায়েঙ্গল!'

পাইকিরি বিয়ার খেকো সূয্যি রায় বললে, 'চাচা হরবকতই ট্রায়েঙ্গল দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমীর দেখা। দ্য ত্রো নিয়ে কি কেউ কখনো বেরয় না?'

রায়ের গ্রাম সম্পর্কে ভাগ্নে, সতেরো বছরের চ্যাংড়া সদস্য লাজুক গোলাম মৌলা শুধালে, 'মামু, দ্য ত্রো কারে কয়?'

রায় বললেন, 'পই পই করে বলেছি ফরাসী শিখতে, তা শিখবিনি। ডি, ই দ্য; টি, আর, ও পি ত্রো—পি সাইলেন্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশী—One too many। এই মনে কর, তুই যদি তোর ফিয়াঁসেকে—এ কথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?—নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তোদের সঙ্গে জুটে যাই, তবে আমি দ্য ত্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বার্লিনের শীতে বরাব্বর লজ্জায় ঘামতে লাগল।

আড্ডার লটবর লেডি-কিলার পুলিন সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বললে, 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে বুড়বক্? লজ্জা পাবেন রায়। ডাণ্ডা-গুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাস্নি ডাণ্ডাকে না ছোঁবার জন্য। তখন কি বলিস্? 'ভাগ্নে বৌ দুয়ারে—কোনা কেটে ফাল্দি যা।' বরঞ্চ সূয্যি রায় যদি তাঁর ম্যাডামকে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিন্তু তুই দ্য ত্রো নস্। রাধা কেষ্টর কি হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবারে লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোঁসাই বললেন, 'চাচা, আপনি কিন্তু যেভাবে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে হুটো-হুনো-একটা-মেনীর ব্যাপার। তা কি কখনো হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়। অবশ্য প্র্যাক্‌টিস্ থাকলে?'

আড্ডা সমস্বরে বললে, 'প্র্যাক্‌টিস্!'

চাচা বললেন, 'হ। এবারে দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবার দেখি, জাহাজ ভর্তি ইহুদির পাল। জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ঝেঁটাই করে সবাই যাচ্ছে শাংহাই। সেখানে যেতে নাকি ভিজার প্রয়োজন হয় না। কি করে টের পেয়েছে, এবারে হিটলার দাবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজারের বেবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি নয়, এবারে স্রেফ কচু-কাটার পালা। তাই শাংহাই হয়ে গেছে ওদের ল্যাণ্ড অব মিল্‌ক্ এণ্ড হানি, ননীমধুর দেশ।

আমার ডেক-চেয়ারটা ছিল নিচের তলা থেকে ওঠার সিঁড়ির মুখের কাছে। ডাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বাঁয়ে এক ফরাসী উকিল। ইহুদি ভিয়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসী জানে না। আর ফরাসী উকিল জর্মন জানে না, সে তো জানা কথা। ফরাসী ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে যে অন্য ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার করলে। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা ফরাসী, পিজিন ফ্রেঞ্চই চলে—বিদেশীরা প্যারিসে এলে যে রকম টুকিটাকি ফরাসী বলে ঐ রকম আর কি।

তিনজনাতে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক একবার সিঁড়ি

দিয়ে উঠনে-ওলা নামনে-ওলা চিড়িয়াগুলোর দিকে তাকাই তারপর বইয়ের দিকে নজর ফিরিয়ে আপন আপন সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্কা উঠলেন। জর্মন ইহুদি বললে, 'হাল্‌ব্‌-উন্‌ট-হাল্‌ব্‌—অর্থাৎ হাফাহাফি।' ফরাসী বললে, 'অঁ প্যো আঁসিয়েন্‌—একটুখানি এনশেণ্ট।' জর্মন আমাকে শুধালে, 'ফ্রেঞ্চি কি বললে?' আমি অনুবাদ করলুম। জর্মন বললে, 'চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ হবে। তা আর এমন কি বয়েস—নিষ্‌ট্‌ ভার—নয় কি?' ফরাসী আমাকে শুধালে, 'ক্য দিতিল—কি বললে ও?' উত্তর শুনে বললে, 'মঁ দিয়ো—ইয়াল্লা—চল্লিশ আবার বয়েস নয়! একটা কেথীড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মেয়েছেলে, ছোঃ!'

এমন সময় হঠাৎ এক সঙ্গে তিনজনার তিনখানা বই ঠাস করে আপন আপন উরুতে পড়ে গেল। কোর্ট মার্শালের সময় যে রকম দশটা বন্দুক এক ঝটকায় গুলি ছোঁড়ে। কি ব্যাপার? দেখ্‌তো না ত্যাখ্‌, সিঁড়ি দিয়ে উঠলো এক তরুণী।

সে কী চেহারা! এ রকম রমণী দেখেই ভারতচন্দ্রের মুণ্ডুটি ঘুরে যায় আর মানুষে দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন, 'এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।'

ইটালির গোলাপী মার্বেল দিয়ে কোদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখীটি গোলাপী আকাশে ডানা মেলেছে, চোখ দুটি সমুদ্রের ফেনার উপর বসানো দুটি উজ্জ্বল নীলমণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অপর্ণার আবক্ররেখা মুখের সৌন্দর্যকে দু'ভাগ করে দিয়েছে; ঠোঁট দুটিতে লেগেছে গোলাপ ফুলের পাপড়িতে যেন প্রথম বসন্তের মৃদু পবনের ক্ষীণ শিহরণ।'

চাচা বললেন, 'তা সে যাক্‌গে! আমার বয়েস হয়েছে।

তোদের সামনে সব কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে! কিন্তু সত্যি বলতে কি অপূর্ব, অপূর্ব!

দেখেই বোঝা যায়, ইহুদি—প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অদ্ভুত সম্মেলন।

জর্মন এবং ফরাসী দুজনেই চুপ! আম্মো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের দু'প্রান্ত থেকে চুম্বকে টানা লোহার মত তার মায়ের দু'দিকে যেন সেঁটে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এতক্ষণ ধরে দু'জনাই তার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম দু'একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে কার পাকাপাকি দোস্তী হবে। কোন্ মসিয়ো কোন মাদ্মোয়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন্ হ্যার্ কোন্ ফ্রাউ বা ফ্রলাইনের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কোন্ মিসিস কোন্ মিস্টারের সঙ্গে রাত তেরোটা অবধি খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন। এ তিনটির বেলা কিন্তু সবাই বুঝে গেল এটা ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গল। আমি অবশ্য গোঁসাইয়ের মত প্রথমটায় ভাবলুম, হার্মলেস ব্যাপারও হতে পারে।

মেয়েটা ফরাসিস, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে। প্যারিস থেকেই নাকি রঙ্গরস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনারই মনে প্রশ্ন জাগলো, আখেরে জিতবে কে?

শুনেছি, এহেন অবস্থায় দুজনাই স্প্যানিয়ার্ড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একে অন্যকে গম্ভীরভাবে স্টিফ বাও করে দু'দিকে চলে যায়, ফরাসী হলে নাকি ভাগাভাগি করে নেয়।

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি গেলেন হেরে। মারাঠা চালাকী করে ডবল পয়সা খর্চা করে দু'খানি ডেক-চেয়ার ভাড়া করে

রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেললো না কেন আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই হুরীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক-চেয়ারের দিকে—স্যার ওয়ালটর রেলে যে রকম রানী ইলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোব্বা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেণ্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দু'জনা লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকান্তের মত সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়লো।

আমার পাশের ফরাসী বললে, 'ইডিয়ট!' জর্মন শুনে বললে, 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' 'এ্যাঁপসিব্‌ল্!' 'বেট্?' 'বেট্!' 'পাঁচ শিলিঙ?' 'পাঁচ শিলিঙ'!'

আড্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, 'বিশ্বাস করো আর নাই করো, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল এই বাজি ধরাধরিতে। বুকিরও অভাব হল না। আর সে বেট্ কী অদ্ভুত ফ্লাক্‌চুয়েট করে। কোনোদিন ভোরে এসে দেখি জর্মনটা গুম্ হয়ে বসে আছে—যেন জাহাজ একটা কনসান্‌ট্রেশন ক্যাম্প—আর ফরাসীটা উল্লাসে ক্রিং ব্রিং করে পল্‌কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কি? পাক্কা খবর মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দু'টো অবধি মারাঠার সঙ্গে গুজুর-গুজুর করেছেন। বেনে মনের খেদে এগারোটাতেই কেবিন নেয়। ফরাসী এখন সক্কলের গায়ে পড়ে থ্রি টু ওয়ান অফার করছে। সে জিতলে পাবে কুল্লে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝ ঠ্যালা! আর কোনোদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজের ক্যাম্বিসের চৌবাচ্চায় হুরীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে—মারাঠা জলকে ভীষণ ডরায়। ব্যস্, সেদিন বেনের স্টক স্কাই হাই!

ইতিমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড্ড ঢিলে যাচ্ছে তখন ঘটলো এক নবীন কাণ্ড। হুরী ও মারাঠা তো বসতো পাশাপাশি

কিন্তু লাইনের সর্বশেষে নয় বলে হুরীর অন্য পাশে বসতো এক অতিশয় গোবেচারা ভালো মানুষ নিগ্রো পাদ্রী। সে গিয়ে তার ডেক-চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক-চেয়ারের বদলাবদলীর প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা বলে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টেডি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠলো, এ বেটিঙের শেষ ফৈসালা হবে কি প্রকারে? বহু বাক্-বিতণ্ডার পর স্থির হলো, যেদিন হুরী মারাঠা কিংবা বেনের সঙ্গে তার কেবিনে ঢুকবেন সেদিন হবে শেষ ফৈসালা। যার সঙ্গে ঢুকবেন তার হবে জিত।

দু'একজন রুচিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ফরাসী উকিল হাত-পা চোখ-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিল, 'C'est c'est—,এটা, এটা হচ্ছে একটা লিগাল ডিসিশন, একটা আইনত ন্যায্যত হক্কের ফৈসালা। ঢলাঢলির কোনো কথাই হচ্ছে না।'

রেসের বাজি তখন চরমে। কখনো বেনে, কখনো মারাঠা। সেই যে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখীকে গুলি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরকেও দিয়েছে লেলিয়ে। তখন বুলেটে কুকুরে কি রেস্—কভী কুত্তা, কভী গুলি, কভী গুলি, কভী কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢুকলুম আরব সাগরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠারো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মৌসুমী হাওয়া তার বাইশ হাজারি টনের থাবড়া। জাহাজ উঠলো নাগর বেনাগর সবাই নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে কী সী সিক্‌নেস! বমি আর বমি! প্রথম ধাক্কাতেই মারাঠা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনের মুখে শুকনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না। পরদিন সমুদ্রে ধরলো রুদ্রতর মূর্তি। এবারে হুরী পড়ে রইলেন একা। তাঁর মুখও হরতালের মত হলদে।

তারপরের দিন ডেক প্রায় সাফ। নিতান্ত বরিশালের পানি-জলের প্রাণী বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোনোগতিকে আমি টিকে আছি আর কি? খাবার সময়ে পেটে যা যায় সে-সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে মোকামে পৌঁছবার আগেই ফিরিফিরি করছে। হুরী নিতান্ত একা বলে ফরাসী বন্ধু তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসালে।

সে রাত্রে জাহাজ খেলো ঝড়ের মোক্ষমতম থাবড়া। ফরাসী গায়েব। হুরী এই প্রথম ছুটে গিয়ে ধরলো রেলিঙ। আমিও এই যাই কি তেই যাই। তবু ধরলুম গিয়ে তাকে। হুরী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'কেবিন'। আমি ধরে ধরে কোনোগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চললুম। দুজনাই টলটলায়মান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছতেই ঝড়ের আরেক ধাক্কায় খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়লুম দুজনাই ভিতরে। কি আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছানায় শোয়ালুম। তারপর কেবিন-বয়কে ডেকে দু'জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলুম তার কেবিনে। বাপ্‌স্।'

চাচা থামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আড্ডার সবাই একবাক্যে শুধালে, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'কচু, তারপর আর কি?'

তবু সবাই শুধায়, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'এ তো বড় গেরো। তোরা কি ক্লাইমেক্‌স্ বুঝিসনে? আচ্ছা, বলছি। ভোর হতেই বোম্বাই পৌঁছলুম। ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধরে কেউ বলে কন্‌গ্রাচুলেশনস্‌, কেউ বলে গ্রাতুলিয়েরে—ছুচ্ছাই, এ-সব কী? কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি বুঝিয়ে বলে না।

শেষটায় ফরাসী উকিলটা বলে, 'আ মসিয়ো, কী কেরদানিটাই

না দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাত। মহারাষ্ট্র গুজরাত দু'জনাই হার মানলো জিতলে বেঙ্গল। ভিভ্‌ল্যা বাঁগাল? লং লিভ বেঙল!'

আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনো কথা শোনে না।

আর শুধু কি তাই? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরত পেল—বেনে কিংবা মারাঠা কেউ জেতেনি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্রেফ, বেপরোয়া, মেরে দিলে। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হক্ক নেই। টাকাটা নাকি তছরূপ হয়ে যায়।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, 'কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গেল কোথায়।'

এমন সময় সেই দুই জর্মন ছোকরায় লেগে গেল মারামারি। সেটা থামাতে গিয়ে আড্ডা সেদিন ভঙ্গ হল।

হীরো

রক শুধালে, 'চাচা আপনি 'রীডারজ ডিজেস্ট' পড়েন?'

আমি বললুম, 'না, ভাই। ওতে আমার দিল্‌-চস্‌পী নেই।'

ঘন্টুর শব্দতত্ত্বে কোনো প্রকারের 'দিল্‌-চস্‌পী' থাকার কথা নয়। তবু শুধলে, 'চাচা, আপনার মুখে এ শব্দটা একাধিকবার শুনেছি। হালে সিনেমাতেও শব্দটা একই ফিল্মে বার দু'তিন কানে গেল। মানেটা কি?'

আমি বললুম, 'দিল শব্দটা তো জানিস—হৃদয়। আর ফার্সীতে 'চস্‌পীদন' শব্দের অর্থ সেঁটে যাওয়া, সেঁটে দেওয়া। অর্থাৎ বুকে বুক লাগানো। হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করা। ইংরিজী 'ইনট্রেস্ট্‌' শব্দের ঠিক বাঙলা নেই। ফার্সী এবং উর্দুতে বলে দিল-চস্‌পী। যেমন গাওনা-বাজনায় আমার খুব দিল-চস্‌পী আছে, কিন্তু রেসে বিলকুল দিল্‌-চস্‌পী নেই।'

মশাদা বললে, 'তারো ভালো উদাহরণ: টাকা ধার নেওয়াতে আমার বিস্তর দিল্‌-চস্‌পী—'

ঘন্টু বাকিটা পূর্ণ করে দিলে, 'কিন্তু ফেরৎ দেওয়াতে বে-দিল্‌-চস্‌পী।'

আমি বললুম, 'বেদিল্‌চস্‌পী আমি কখনো শুনিনি।'

টেটেন শুধোলে, 'কিন্তু ডিজেস্ট ভাল লাগে না কেন?'

আমি বললুম, 'পুরো এক থালা যেন চাটনি। ফরাসীতে যাকে বলে 'অর্‌ দ্যভ্‌র্‌'—ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো সসিজ, সার্ডিন, অলিভ—যা খেতে গিয়ে, আসলে কিন্তু হার্টট্রাবলে, মুখুয্যে জাপানে গত হলেন। শক্ত কামড়াবার মত কিছুই থাকে

না—যাকে ফরাসীতে বলে 'পিয়েস্ দ্য রেজিস্তাঁস' 'পীস অব্ রেজিস্টেন্স্।'

টেটেন বললে, 'কিন্তু সর্বশেষে যে মোটা বইয়ের সারাংশ থাকে?'

আমি বললুম, 'সে যেন গ্লাস-কেসের ভিতরকার ক্ষুদে তাজমহল। ওতে যদি সেই আনন্দই পাওয়া যেত তবে আসল তাজ দেখতে যেত কে?'

অজনদা শুধলে, 'কিন্তু মশার চোখ যদি আরো দু'ইঞ্চি ছোট হত, তাহলে কি কিছু ফের-ফার হত?'

বড়দা কথা কয় কম, কিন্তু কেউ কাউকে ছোবল মারলে সেও সরেস মাল ছাড়তে জানে। পানের পিচ বাঁচিয়ে আকাশপানে মুখ তুলে বললে, 'তোমার ঐ ভেটকি-বদন দেখার থেকে নিষ্কৃতি পেত।'

টেটেন বললে, 'কী বিপদ! আমার প্রশ্নটা শুধবার ফুর্সতই পাচ্ছিনে যে! আচ্ছা, চাচা, ঐ যে 'আমার পরিচয়ের অবিস্মরণীয় মানুষ' ঐ সিরীজের লেখাগুলো কি সত্যি, না বানানো?'

আমি অনেকক্ষণ মাথা চুলকে বললুম, 'মিথ্যা আর সত্যে পার্থক্য করা বড় কঠিন—বিশেষ করে আর্টে, সাহিত্যে। যেমন মনে কর, তুই একটা ল্যাণ্ডস্কেপ পেণ্ট করছিস। সেখানে একটা শুকনো খেজুর গাছ তোর পছন্দ না হওয়াতে তুই সেটা তুলে দিয়ে সেখানে একটা কদম গাছ লাগালে কেউ কিচ্ছু বলবে না, কিন্তু যদি কারো ফোটোগ্রাফ তুলতে চাস তবে সেখানে কোনো লিবার্টি নেওয়া চলবে না। অথচ সেখানেও সমূহ বিপদ। লেনসটার উপরে হয়তো ময়লা জমেছে, ফিল্মটা হয়তো পুরনো, ফোকাসে ভুল হয়ে গেল—ফলে মূলের সঙ্গে মিল রইল কমই। ঠিক তেমনি 'আমার অবিস্মরণীয় মানুষের' বর্ণনা আমি যখন দিই তখন ভাবি সত্যের সঙ্গে খাপ

খাইয়েই সেটা আমি করছি, কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গি (লেন্‌স্), আমার স্মৃতিশক্তি (ফিল্‌ম—পূর্ণা কিংবা নয়া ঘটনা) যে ঠিক ঠিক বর্ণনা দিতে সাহায্য করছে কি করে জানবো? তিন সাধু জন আদালতে হলফ খেয়ে তিন রকমের বর্ণনা দেয়—সে তো আকছারই হচ্ছে। আর যে 'অবিস্মরণীয় চরিত্রের' বর্ণনাটা পড়ে তোর প্রাণটা জুড়িয়ে গেল, সেই 'চরিত্রকে' সেটা পড়ে শোনালে সে হয়তো ঝাঁটা হাতে তাড়া লাগাত। আমার এ রকম একটা চরিত্রের সঙ্গে—।'

মুকুলদি কিমামের কৌটোটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'সেইটেই দয়া করে বলুন—এসব আবোল তাবোল বকে কি হবে?' মুকুলদি উত্তম মুভি তুলতে জানে, ছবিও আঁকতে পারে; তাই এসব থিয়োরিতে তার দিল-চস্‌পী নেই। পোস্ট-মর্টেমে খুনীর কি ইন্‌ট্রেস্‌ট?

'সে আমার প্রথম যৌবনের কথা। দেশে ফিরে বসেছি বড়দার বৈঠকখানার বারান্দায়। এমন সময় দেখি, রাস্তার উপর দিয়ে দূর থেকে যেন একটা সাক্ষাৎ তালগাছ ঝড়ের বেগে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। বাড়ির সামনে আসতে দেখি, সে এক অপরূপ প্রাণী। নিদেন ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, তার উপর ভদ্রলোক পরেছেন প্রায় এক ফুট উঁচু তুর্কী টুপী। ঝড়ের মত চলার বেগে সেই টুপীর ফুন্না বা ট্যাসেল টুপীর উপর চর্কি-বাজির মত চক্কর খাচ্ছে। বারান্দা থেকে রাস্তা অন্তত দশ গজ দূরে, তবু তাঁর গতি-বেগ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার সেই ছ ফুট চওড়া বিরাট পুরু লংক্লথের পাজামার ঘর্ষণ থেকে। কদম এক এক খানা যে দৈর্ঘ্যের ফেলছেন তাতে মনে হয় পাজামার ভিতর বুঝি রণ-পা লুকনো রয়েছে। আচকানটা নেমে এসেছে প্রায় জুতো পর্যন্ত—পাজামার ইঞ্চি চারেক দেখা

যায় কি না যায়। ইয়া বিরাট চাপ দাড়িতে বুক ঢাকা। তুর্কী টুপীর নিচের থেকে নেমে এসেছে ঢেউ খেলানো মিশ কালো ঘন বাবরী চুল—প্রায় গ্রেটা গার্বো লেন্‌থ,। চলার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতখানা দুলছে যেন সার্কাসের লোহার ডাণ্ডার দুলনা তাঁবুর এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি। বাঁ বগলে ফুলস্কেপ কাগজের রোল-করা এক বিরাট বোন্দা। দৃষ্টি সোজা সমুখ পানে। চলেছেন রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে।

সাঁই সাঁই শব্দ করে তিনি আমাদের বৈঠকখানা পেরিয়ে গিয়ে মোড় নিলেন বাবার বৈঠকখানার দিকে।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই বাবার চাপরাশী মহরমদী এসে আমায় তলব করলে। ফতুয়াটা গায়ে চড়াতে না চড়াতেই দেখি সেই আচকান-পাজামা-পরা তালগাছ পূর্বের চেয়েও গতি বাড়িয়ে আমাদের বারান্দায় এসে হাজির। আমি সালাম করার পূর্বেই আমাকে সালাম করে আসন নিলেন শক্ত কাঠের চেয়ারের উপর—যদিও আমি বেতের চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়েছিলুম।

কুশলাদির প্রথম কথাতেই আমি আশ্চর্য হলুম তাঁর গলা শুনে। আমি ভেবেছিলুম, তাঁর গলা থেকে প্রতিটি লব্‌জো বেরবে তোপের শব্দ নিয়ে, নিদেন পক্ষে বন্দেমাতরমের আওয়াজ ছেড়ে। কোথায় কি? ঠিক যেন ওস্তাদ আব্দুল করীম খান সাহেবের মধুর কণ্ঠস্বর—এবং সেও এত মৃদু যে তৃতীয় ব্যক্তি শুনতে পাবে না। গলা থেকে মানুষ চিনতে গেলে বলতে হবে লোকটি বড়ই নিরীহ। আর দ্বিতীয় জিনিস লক্ষ্য করে আরো আশ্চর্য হলুম। ঐ বিরাট-বপু লোকটার জুতোর নম্বর ছয় হয় কি না হয়!

বোধ হয় একটুখানি সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'দেখুন দেখি, আপনার ওয়ালিদ্ সাহেব (পিতা) আমাকে কী বিপদে

ফেলেছিলেন। আপনাকে ডেকে পাঠালেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে! তাও কখনো হয়! আমি তো এক রকম তাঁর ইচ্ছা অমান্য করেই এখানে ছুটে এলুম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি আপত্তি করেননি।'

কথা-বার্তায় প্রকাশ পেল তিনি মৌলানা জলাল উদ্দীন রূমীর কাব্য মসনবী খানা অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছেন। আমার পিতৃদেবকে দেখাতে এসেছিলেন। তিনি শুনে বলেছেন, এসব ব্যাপারে নাকি আমার দিল্-চস্‌পী প্রচুর। তাই আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।

আমি তো অবাক! বিরাট সে গ্রন্থ। সে আমলে এর ইংরিজী অনুবাদও কেউ বুক বেঁধে করে উঠতে পারেনি।

মশাদা শুধোলে, 'কে যেন তাঁর একটি গল্প 'তোতা-কাহিনী' না কি যেন অনুবাদ করেছে তাও গদ্যে। কিন্তু গল্পটি অসাধারণ সুন্দর। পুরো কাব্য কি এখন ইংরিজীতে পাওয়া যায়?'

আমি বললুম, 'যায়। নিক্‌ল্‌সন্ না কে যেন দশ না চোদ্দ বছর খেটে করেছে—তাও গদ্যে।

আর সে কাব্য অনুবাদ করা কি চারটিখানি কথা!'

মশাদা বললে, 'বড্ড কঠিন নাকি?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উল্টো। অতি সহজ। মিল, ছন্দ উপমা, ধ্বনি এতই সহজ যে অনুবাদে সে সরলতা কিছুতেই আনা যায় না। এ ধরনের বইকেই ইংরিজীতে বলা হয়, ডিস্‌পেয়ার অব্ ট্রেন্‌সলেটারস্।'

ভদ্রলোক তখন বিস্তর ইতি-উতি করার পর বগলের বোন্দাটা নামিয়ে, লম্বা ফুলস্কেপ কাগজ হাত দিয়ে ডলে সোজা করে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।

রকফেলাররা একবাক্যে শুধোলে, 'কি রকম হয়েছিল অনুবাদটা?'

আমাদের ব্লকের এই একটা মস্ত গুণ যে সবাই বড় দরদী। প্রশ্নর সুরেই বোঝা গেল তারা কি উত্তর প্রত্যাশা করছে।

টেটেনের দিকে তাকিয়ে বললুম, এখন বুঝলি টেটেন, সত্য-কথন কতখানি কঠিন, হুবহু ফোটোগ্রাফ তোলাতে কতখানি কস্ত।'

টেটেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'একদম রদ্দি বুঝি?'

আমি বললুম, 'না, এই মাঝারি। বরঞ্চ বলবো, মসনবী অনুবাদ কী কঠিন কর্ম জানা ছিল বলে মনে হল, আশাতীত ভালো। আর ছন্দটি নিয়েছিলেন রাজসিক, তাঁর দাড়ির চেয়েও লম্বা ;—

'কন সদাগর তোতা পাখীটিরে কোনো ভয় তুমি রেখো না মনে.
সওগাত আমি নিশ্চয় আনিব খুঁজিবো তাহারে শহরে বনে।'

মশা বললে, 'তার পর'?

ভদ্রলোক নিজেই বললেন, 'অনুবাদটা আমারই পছন্দসই হয়নি। কিন্তু কি জানেন, এটা পড়ে যদি যোগ্যতর ব্যক্তি একখানা উত্তম অনুবাদ করে তবেই আমার শ্রম সফল।'

এতখানি বিবেচক লোককে উৎসাহ দেবে না কোন পাষণ্ড। আমি বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে এগিয়ে যান।'

রাত্রিবেলা বাবার কাছে শুনলুম, ভদ্রলোক ছ'মাইল দূরে গ্রামে বাস করেন, সেখানকার ম্যারিজ রেজিস্ট্রার, অর্থাৎ কাজী সাহেব। ঝাড়া পনেরো বছর মুসলমান শাস্ত্রাদি দিল্লী (দেওবন্দ), রামপুরে অধ্যয়ন করে দেশে ফিরেছেন। ফার্সী এবং উর্দুতে উত্তম কবিতা লিখতে পারেন, কিন্তু দিল্-চস্পী বাঙলাতে,—যদিও পাঠশালার পর বাঙলা অধ্যয়নের সুযোগ তাঁর হয়ে ওঠেনি।

একটা পান দে না রে, ও মুকুলদি।

তারপর কাজীসাহেব মাঝে মধ্যে আসেন, অনুবাদ শুনিয়ে যান।

আমার মা ওঁকে খাওয়াতে বড্ড ভালোবাসতেন। কি করে জানিনে, জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, পাছে তাঁর স্ত্রী ভাবেন তিনি

একটা আস্ত রাক্ষস তাই বাড়িতে খান অল্পই। মা'র হয়ে আমি তাঁকে পীড়াপীড়ি করতুম আর তিনি প্রতিবার খেয়ে উঠে দাড়ির ভিতর দিয়ে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলতেন, 'এই বাড়িতেই আল্লা আমার দানাপানি রেখেছিল।'

এর কিছুদিন পরেই আমাদের অঞ্চলে হাহাকার উঠলো। ফেঁচুগঞ্জ অঞ্চলে খেয়া নৌকো ডুবিতে বিস্তর লোক মারা গিয়েছে—পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যতটা ভয় করা হয়েছিল ততটা নয়—কারণ সিলেট পানি-জলের দেশ—সাঁতারে অক্ষম অল্প লোকই। কিন্তু আসল কথা খবরের কাগজে বেরল পরের দিন—

"প্রকাশ, মুনশীবাজার গ্রামের কাজী মৌলবী শের মুহম্মদ খান ঐ খেয়া নৌকা ডুবির সময় একটি মণিপুরী রমণীকে প্রাণে বাঁচাইয়াছেন। রমণী সন্তরণে সম্পূর্ণ অক্ষম। কাজী সাহেব সেই রমণীকে অবশ্য মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক ক্রোশ সন্তরণ করিয়া অবশেষে তীরে অবতীর্ণ হয়েন। আরো প্রকাশ, মণিপুরী রমণীর ওজন প্রায় আড়াই মণ এবং কাজী সাহেব যখন পারে অবতীর্ণ হইলেন তখন তাঁহার ইজার-আচকান এমন কি তাঁহার তুর্কী টুপী কিংবা একটি পাদুকাও স্থানচ্যুত হয় নাই।"

হাজরা রোডের রক হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'শাবাশ'

অজনদা বললে, 'চাচা' আপনার বর্ণনাতে যা হয়নি, এই ঘটনার বিবৃতিতে তা হয়ে গেল—এতক্ষণে বুঝলুম, আপনার কাজী সাহেবের গতরে কী অসুরেরই জোর ছিল।'

বড়দা বললেন, 'ল্যাটে বুঝলে হে অজন, ল্যাটে।'

আমি বললুম, 'খবরটা প্রথম পড়েছিলেন বাবা। তিনি আমাদের সবাইকে ডেকে সেইটে রসিয়ে রসিয়ে পড়লেন। দেখি, দেমাকে মাটিতে তাঁর পা পড়ছে না—তাঁর কাজীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

ইতিমধ্যে চাপরাশী মহরমদী এসে উপস্থিত। সে বাজারে খবরটা শুনে এসেছে। আস্তে আস্তে আমাকে বললে, 'জানেন, ঐ মণিপুরী ঔরৎটা কে?' আমি বল্লুম, 'না তো'। বললে, 'ঐ যে হাতীর গতর ইয়া লাশ বেটি। হাটের দিন আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে ধামায় করে গামছা বিক্রি করতে যায়।'

বাবা, দাদারা আমি সবাই স্তম্ভিত। ও রমণীর বর্ণনা দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। বোন্দা বোন্দা, পিণ্ড পিণ্ড, ধামা ধামা স্রেফ চর্বি দিয়ে তৈরী সে রমণীর দেহ। মাথায় ধামা। সর্বাঙ্গ থলথল করছে। আর ঘোর শীতকালেও সর্বদেহ থেকে গলগল করে ঘাম ঝরছে। হাঁপাচ্ছে আর এগোচ্ছে, গাছ-তলায় বসে জিরোচ্ছে আর হাঁপাচ্ছে। প্রতিদিন চর্চির গোলা বেড়েই যাচ্ছে এবং শেষের দিকে ওর ঠেলায় তার মুখ আর চোখদুটো প্রায় দেখাই যেত না। এই তো দেখে আসছি ছেলেবেলা থেকে।

নদীর স্রোতে কাজী সাহেব এই হিমালয় বয়েছেন পাক্কা এক কোশ!

আমার বাবা প্রাচীন পন্থী ধর্মভীরু লোক ছিলেন। বেপর্দা রমণীর দিকে তাকাতেন না। এখন দেখা গেল, সে রমণী তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'ও, তাই নাকি!' বলে বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। আমরা গুড়িগুড়ি বড়দার বৈঠক-খানায় গিয়ে প্রথম এক চোট চাপা হাসিটা হেসে নিলুম—সক্কলের মুখে ঐ এককথা, 'সমূচা তুর্কী টুপী জুতো সহ কাজী সাহেব উঠলেন নদীর ওপারে—ঔর বগলমে মণিপুরী ঔরৎ---ইয়া লাশ।'

ইতিমধ্যে বাবা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন একখানা পোস্টকার্ড—কাজী সায়েব বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন বলে এবং একটি মানুষের প্রাণরক্ষা করতে পেরেছেন বলে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা। আমরা পড়ে ডাকে পাঠিয়ে দিলুম।

দিন দুই পর সে কী তুল-কালাম কাণ্ড! প্রথমটায় দেখলুম কাজী সাহেব টর্ণাডো বেগে উঠছেন বাবার বারান্দায়—আর এই প্রথম দেখলুম, তাঁর বগলে মসনবীর বোন্দা নেই, যদিও হাটে মাঠে ঘাটে খেয়াপারে মসজিদে তাঁকে বোন্দাহীন অবস্থায় কেউ কখনো দেখেনি। আর এই প্রথম শুনি তাঁর সেই মৃদুল স্বর আর নেই। নাক দিয়ে সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মণী বলদের মত শ্বাস-নিশ্বাস প্রস্ফুরিত হচ্ছে, চাপ দাড়ি চিত্তিরবিত্তির ছড়িয়ে পড়েছে, চোখে মুখে জুগুপ্সা—জিঘাংসা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আর বারবার একই কথা বলছেন, 'আপনিও, আপনিও!'

আমরা হাবা বনে খনে বাবার দিকে খনে কাজী সাহেবের দিকে তাকাই। বাবাই বুঝিয়ে বললেন, 'কাজী বলছেন, ঐ মণিপুরীকে বাঁচাবার কোন মৎলবই তাঁর ছিল না, তিনি নাকি—'

কাজী সাহেব ককিয়ে উঠলেন, 'আমাকে ধরেছে কোমরে জাবড়ে। তওবা, তওবা কী ঘেন্না—' তিনি তারই স্মরণে যেন শিউরে উঠলেন। আমরা যে হাসি ঠেকাতে পেরেছিলুম সে নিতান্তই আল্লার মেহেরবানী!

কাজী সাহেব বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তিনি রুস্তম নন, সোহরাব নন, কারো প্রাণরক্ষা করে বীর পুরুষের খ্যাতি তিনি চান 'না, তিনি আপন প্রাণ নিয়েই তখন ব্যস্ত, ঐ দুশ্‌মন্‌ রমণীটা যদি ও রকম তাঁকে জাবড়ে না ধরতো—আরো কত কী।

বাবা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'চেষ্টা করলেই তো আপনি নিষ্কৃতি পেতে পারতেন।'

কাজী সাহেবের চোখের তারা তাঁর তুর্কী টুপীর ফুন্নায় গিয়ে ঠেকেছে। এবারে কক্ককিয়ে বললেন, 'হুজুর ঐ ঔরতের লাশ তো দেখেননি—তাই বললেন।'

নিতান্ত সত্যের অপলাপ হয় বলে বাবাকে আপত্তি জানাতে হল।

আমি বললুম, 'যাকে আপনি দু'মাইল বয়ে নিয়ে যেতে পারলেন—'

কাজী সাহেব প্রায় কেঁদে উঠলেন, 'কে বলে দু'মাইল! আমি ঐ খবরের কাগজওলাদের যদি একদিন পাই!' হাত দুটো তিনি মুষ্টিবদ্ধ করলেন। 'এক মাইল হয় কি না হয়।' আমরা বললুম, 'এক মাইলই সই, আধ মাইলও সই—তাই কি কম? ফেঁচুগঞ্জের ঐ জলের তোড়ে, মাঝ গাঙে—'

কাজী সাহেব বললেন, 'মাঝগাঙে তোড় কম—'

মোদ্দাকথা, কাজী সাহেবের গোড়ার দিককার বিরক্তি এখন ঘোর ক্রোধে পরিণত হয়েছে। টেলিগ্রাম, চিঠি, গ্রামের ছোঁড়াদের 'জিন্দাবাদ' চীৎকারে তাঁর সুখ-শান্তি গেছে। মসনবী সিকেয় উঠেছেন। তাকে আত্মত্যাগী, মৃত্যুভয়ে অকাতর পরম বীরপুরুষ বানিয়ে কতকগুলো বাঁদর তাকে বাঁদর নাচ নাচাতে চায়। তিনি ঐ মর্মে একটি দেমাঁতি (dementi)—প্রতিবাদ—লিখেছেন। সেইটে বাবাকে দেখিয়ে কাগজে পাঠাবেন এমন সময় বাবার কার্ড পৌঁছে তাঁর হৃদয় বেদনা চরমে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

প্রতিবাদটি তিনি লিখেছিলেন অতিশয় বিশুদ্ধ সংস্কৃতে—যদিও অজ্ঞলোক সেটাকে বাঙলা মনে করতে পারে ;—

"এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞাত কৃত হইতেছে যে অধম শের মুহম্মদ খান কদাপি বীরর্ষভ নহে। আত্মরক্ষার্থেই সে শশব্যস্ত—ইত্যাদি ইত্যাদি।'

প্রতিবাদটি পড়তে পড়তে এত দুঃখের ভিতরও কাজী সাহেবের মুখে এই প্রথম এক ছটাক হাসি ফুটলো। আমাদের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'ভাষাটা কি রকম হয়েছে?'

কোরাস	বড়দা—'অপূর্ব, অপূর্ব।' মেজদা—'অনবদ্য, অনবদ্য!' আমি—'সাধু, সাধু!'

বাবা বললেন, 'পত্রিকাওলারা এটা ছাপাবে না।'

কাজী সাহেব আশ্চর্য হয়ে শুধোলেন, 'হক্ কথার প্রতি তাদের কি কোনোই মহব্বৎ নেই?'

বাবা বললেন, 'ওরা একটা জিনিস নিয়ে মেতেছে। যে বেলুন উড়িয়েছে সেটা নিজেরাই ফুটো করতে যাবে কেন?'

এমন সময় আমাদের বাড়ির বুড়ী দাসী এসে বললে, মা বলে পাঠিয়েছেন, কাজী সাহেব যেন নেয়ে খেয়ে যান—এরকম লোককে নাকি খাইয়ে সুখ।

'ইয়াল্লা' বলে কাজী সাহেব দু'হাতে মাথা চেপে তক্তপোষে বসে পড়লেন।

অজনদা আমাদের ভিতর বিচক্ষণ সংসারী লোক। সে বললে, 'চাচা, আপনারা ধীরস্থির ভাবে ওঁকে বোঝালেন না কেন, তিনি যত আপত্তি জানাবেন শ্রাদ্ধটা তত বেশী গড়াবে। তিনি চুপমেরে থাকলে গেরোটা আপনার থেকেই খুলে যাবে।'

আমি বললুম, 'বাবা তো ওঁকে সেই কথাই বার বার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কাজী সাহেবের আপত্তি, তা হলে তিনি যে একটি মহাপুরুষ সে 'অপবাদ' যে তাঁর থেকেই যাবে।

তা সে যা-ই হোক, আমরা প্রতীক্ষা করে রইলুম, কাগজ প্রতিবাদ ছাপায় কি না। আমরা থাকি মহকুমা টাউনে, কাগজ বেরয় সদরে।

বুধবার সকালে কাগজ আসবার কথা। মঙ্গলবার রাত দশটায় কাজী সাহেব পুনরায় তেড়ে উঠলেন বাবার বারান্দায়। তিনি আকছারই চোদ্দমাইল দূরের স্টেশনে 'বেড়াতে' যেতেন। সেখান

থেকে কাগজখানা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আমাদের অনুমান ভুল; 'বিজয়শঙ্খ' ফলাও করে কাজী সাহেবের দেমাঁতি ছাপিয়েছে। কিন্তু—

কাজী সাহেব চিল-চ্যাচানীতে ডুকরে উঠলেন, 'দেখুন, কি সম্পাদকীয় লিখেছে।' তারপর কাতর কণ্ঠে বাবাকে বললেন, 'খান বাহাদুর সাহেব, আল্লা আমার সাক্ষী, আমি জীবনে কখনো কারো অমঙ্গল কামনা করিনি, তবে এরা আমার পিছনে লেগেছে কেন?'

বড়দা চেঁচিয়ে পড়লেন,

"আমরা বাঙালী। বঙ্গ ভাষা আমাদের ভাষা। বঙ্গীয় সমাজ আমাদের সমাজ। মা বঙ্গভারতী, তোমার বিজয়-শঙ্খ এই পতিত জাতির পাপ-তাপ দূর করুক।"

রক এক বাক্যে চেঁচিয়ে বললে, 'চাচা, আপনার মেমারিটা খাসা। আমি বললুম, 'মেমারি না কচু।' 'বিজয় শঙ্খের' সম্পাদক দু হপ্তা অন্তর অন্তর এই ফরমুলা মোকা-বেমোকায় কোনো না কোনো জায়গায় ঢুকিয়ে দিত, তাই সড়গড় হয়ে গিয়েছিল। তা সে যাই হোক বঙ্গভারতী টারতীতে কাজী সাহেবের কণামাত্র আপত্তি নেই—আপত্তি যেখানে সম্পাদক বলেছে, "ও হো হো কী অসাধারণ বিনয়ী পুরুষ। সম্পূর্ণা অপরিচিতা রমণীর জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত মহাপুরুষের পক্ষেই এবম্বিধ বিনয় সম্ভবে। অপিচ এই ঘোর কলিকালে অন্যপক্ষ হইলে আমরা হয়তো সন্দেহ প্রকাশ করিতাম, কিন্তু কাজী শের মুহম্মদ খানের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের যোগাযোগ পূর্বাহ্ণেই একাধিকবার হইয়া গিয়াছে।"

বড়দা এক এক লাইন পড়েন আর পুরনো তানপুরোর কান মললে যে রকম সেটা ক্যাঁও ম্যাঁও করে ওঠে কাজী সাহেব তেমনি আর্তনাদ করে উঠেন।

বড়দা দরদী দিঠি হেনে পড়ে গেলেন, "ত্রিযাত্রা যামিনী প্রদীপ

শিখা অনির্বাণ রাখিয়া তিনি যে পারশ্যের কবিশেখর মৌলানা জালাল উদ্দীন রূমীর পর্বতপ্রমাণ বিরাট মসনবী গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বঙ্গভারতীর অঙ্গদে কুণ্ডলে বিজয়মাল্য পরিধান করাইতেছেন তাহা কি আমাদের ন্যায় অর্বাচীন জনেরও অজ্ঞাত ?"

কাজী সাহেব দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে বললেন, উন্মাদ, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ।'

মেজদা বললেন, কাজী সাহেব, এ আপনার অন্যায়! অবিনাশ চক্রবর্তী এস্থলে ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের কর্তব্য কর্ম করেছে—কণামাত্র মিথ্যা বলেনি।'

কাজী সাহেব মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'না বিয়োতেই কানাইয়ের মা।'

কিন্তু কাজী সাহেবের 'পুণ্যের' ভার পূর্ণ হল যখন দেখা গেল সর্বশেষে সম্পাদক অবিনাশ চক্রবর্তী তর্ক-চুঞ্চু সদাশয় সরকার তথা ছোটলাট সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ দেশমাতৃকার হয়ে তাঁদের অনুরোধ জানাচ্ছেন কাজী সাহেবের এই বীরত্বের যেন যথোপযুক্ত সম্মান দেখানো হয়, এবং এই সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বর্ণপদক দানের যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তারও উল্লেখ করেছেন।

কাজী সাহেব ছন্নের মত ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ি মুখো হলেন।

আমরা কিছুতেই তাঁকে ঠেকাতে পারলুম না।

ঘন্টু বললে, 'একেবারে ক্লাইমেক্সে পৌঁচেছে তখন। তারপর?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ। তবে আমার কপাল ভালো, কাজী সাহেবের সে-'দুর্গতি' আমাকে স্বচক্ষে দেখতে হয়নি। তার কিছু দিন পরেই আমাকে ফের বিদেশে যেতে হল। তবে আমার ছোট বোন আমাকে জানালে, যখন 'বিজয়শঙ্খই' প্রথম খবর ছাপে যে সদাশয় সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হওয়াতে স্থির হয়েছে, কাজী সাহেবকে একটি গোল্ড মেডেল দেওয়া হবে, তখন তিনি বাবার

কাছে এসে পরামর্শ চাইলেন, তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করবেন কি না, কিংবা লাটসাহেবকে—তাঁরই স্বহস্তে মেডেল পরিয়ে দেবার কথা—সব কথা গোপনে চিঠি লিখে জানাবেন কি না, কারণ সবাই নাকি তাঁকে বলেছে, এসবের কোনকিছুটা করলেই লাট-সাহেব বিগড়ে যেতে পারেন এবং তাঁর চাকরী নিয়ে টানাটানি লেগে যেতে পারে। বাবা বলেছেন, ওঁর উচ্চবাচ্য না করাই উচিত।'

দম নিয়ে বললুম, 'কাজী সাহেবের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। শেষ পর্যন্ত সেই কারণেই বোধহয় তিনি মেডেল নিতে রাজী হয়েছিলেন। চাকরী গেলে বীবীকে খাওয়াবেন কি?

কিন্তু আমি কল্পনার চোখেও দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠি।

বিরাট সভা। লেকচারের পর লেকচার চলছে কাজী সাহেবের বীরত্বের গুণকীর্তন করে, অবিনাশ চক্রবর্তী তর্ক-চুঞ্চুর রচিত বিশেষ গান গাওয়া হচ্ছে, কাজী সাহেবের গলা জিরাফের মত লম্বা হলেও অত মালার স্থান হয় না, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে গদ্যে পদ্যে হরেক রকম অভিনন্দন পড়া হচ্ছে, কাজী সাহেবের গাঁয়ের লোক বিস্তর নৌকো ভাড়া করে এসে সভাস্থল গুলজার করে তুলেছে—আর তার মধ্যিখানে কাজী সাহেব ঘেমে ঢোল—ভাবছেন, আল্লায় মালুম কি ভাবছেন, একী উৎকট সংকট, এ কী দুঃস্বপ্ন, এ কী বিভীষিকা।

বোন লিখেছিল, সেদিন সন্ধ্যায়ই শহরে খবর রটে, লাট-সাহেবের এডিসি নাকি শুনেছে, সায়েব কাজী সাহেবের আচকানে মেডেলটি যখন পিন করেন তখন নাকি মৃদুকণ্ঠে ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বলেছিলেন, 'কাজী, তোমার সাহসের সঙ্গে মিলিয়ে গড্ তোমার দেহ দিয়েছেন। কোনোটারই অবহেলা করো না।'

সর্বনাশ!

কাজী সাহেবের শেষ ভরসাটুকুও গেল। তিনি মনে মনে আশা

পোষণ করেছিলেন, মহামান্য সম্রাটের প্রতিনিধি, দেশের রাজা লাটসাহেব অন্তত ধরে ফেলতে পারবেন যে তিনি হীরো নন।

রকফেলারগণ প্রথমটায় চুপ। তারপর কলরব করে অনেকগুলো প্রশ্ন শুধোলে। রকের বড়দা এ পাড়ার একটি মাত্র লোক যে পয়সা দিয়ে বই কিনে পড়ে। মুখ উপরের দিকে তুলে তারই গহ্বরে এক মুঠো ঔড্রদেশীয় গুণ্ডি ফেলে শুধালে, 'আর মসনবী না কি যেন—তার কি হল ?'

'জানিনে। তার অল্প কিছুদিন পরেই বাবা মা গত হলেন। বোনদের বিয়ে হয়ে গেল। দাদারা এদিক ওদিক ট্রানসফার হয়ে গেল। বাড়িতে তালা পড়ল। তারপর পার্টিশেন। হয়তো পূব বাঙলায় বেরিয়েছে। সে-সব খবরতো এখানে পৌঁছয় না।

তবে একটা শেষ সুখবর বোন আমাকে দিয়েছিল। কাজী সাহেব গরীব বলে স্ত্রীকে এক দানা গয়না দিতে পারেননি। সেই কুলো-পানা সোনার মেডেল পেয়ে বউয়ের মুখের খুশী দেখে কাজী সাহেবের মুখেও হাসি ফুটেছিল।'

দুপুর বেলা একলা একলি পেয়ে টেটেনদি শুধোলো, 'আচ্ছা চাচা, এর কতটা সত্যি আর কতটা—?'

আমি বললুম, 'দিদি, তাইতে তোকে গোড়াতেই বলেছিলুম, 'অবিস্মরণীয় চরিত্র' যখন লোকে আঁকে তখন কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা, কে বলতে পারে ?'

॥ স্বব্ ॥

সমূচা হাজরা রোড হাওড়া প্ল্যাটফর্মে সমুপস্থিত। অর্থাৎ হাজরা রোডস্থ আমাদের রকফেলারগণ। অজনদা, মশাদা, ঘণ্টু, মুকুলদি, —ইস্তক পাঁচ বছরের গুড়গুড়ি।

আলিঙ্গন, মস্তকাঘ্রাণ ইত্যাদি শেষ হওয়ার পূর্বেই মশাদা বললে, 'ওঃ কী গরমটাই না পড়েছে! ফোকাস্ ঢিলে করে দিলে।'

মশাদার ঐ একটা গুণ। কোনো নূতন টেক্‌নিক্যাল কাজ আরম্ভ করলে, তার প্রচলিত বুলিগুলো অন্য জিনিসে চট্ করে ট্রান্সফার করতে পারে। এই দুর্দিনে সবাই যখন ফটোগ্রাফি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে সেই সময় মশাদা ঐ কর্মে মন দিয়েছে।

ইতিমধ্যে অ্যারকণ্ডিশন কোচের স্টুয়ার্ড, মেট, রেস্তোরাঁকারের বাবুর্চী ইত্যাদি যাবতীয় চাকর-নফর, সরকারী ভাষায় ক্লাশ ফোর স্টাফ সারি বেঁধে আমায় গার্ড অব অনার দিলে।

আমার চোখে মুখে নিশ্চয়ই ভ্রূকুটিকুটিল বিরক্তি ফুটে উঠেছিল।

রক্ চুপ। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুতেই দেখি ঘণ্টু হনহন করে পালাচ্ছে। মুকুলদি হেঁকে শুধালে, 'ব্যাপার কি? ঘণ্টুদা পালাচ্ছো কোথায়?'

বললে, 'চাচা ক্ষেপেছে। নইলে অ্যারকণ্ডিশনে আসার পয়সাই পায় কোথায়, তাবৎকোচ ওকে সেলাম ঠুকবেই বা কেন? দেদার টিপ্‌স্ দিয়েছে নির্ঘাত। এবারে টাকা ধার চাইবে।'

রক্ বললে, 'সত্যি তো। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

আমি বিরস মুখে বললুম, 'বাড়ি গিয়ে।'

চা টা দেখেই জানটা তর-জল হয়ে গেল। চা আমরা বড় একটা

খাই নে। কিন্তু সামনে না থাকলে আমরা আসামী খুনে। (আমি 'অহমিয়া' বলিনি, মনে থাকে যেন)। ওটা একটা সিম্‌বল্‌। মা কালী নৈবেদ্য ছোঁন না, কিন্তু না দিলে ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'হালের বলদ বিক্রি করে রে, পালের গাই বিক্রি করে।'

সবাই শুধালে, 'সে আবার কি?' এরা শহুরে। 'হালের বলদ,' 'পালের গাই' বলতে কি বুকের পাঁজর, জিগরের খুন জানে না।

বললুম, 'তাই দিয়ে অ্যারকোচের টিকিট কেটেছি—তোরা কলকাতার একশ'তে হিমসিম খাচ্ছিস। আমি যখন দিল্লী ছাড়ি তখন সেখানে ১১৮°।

পদ্মায় যখন উজোন বাইতে হয় তখন পাল যদি বাতাস পায় তা হলে দেখবি—আকছারই দেখবি—একা একজন মাল্লা মাঝ পদ্মা দিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। আর সে কী এফর্ট্‌লেস্‌ ব্যাপার! লোকটার ডান হাত মোলায়েমসে অতি আলগোছে হালের উপর রাখা—যেন কোনো মহারাজ দামী সিংহাসনের মখমল-মোড়া হাতলের উপর হাত রেখে পোর্ট্রেট পেন্টিং করাচ্ছেন। আর বাঁ হাত দিয়ে ধরেছে পালের দড়ি। যেন প্রেমিক অলস রভসে প্রিয়ার বিনুনিটি তুলে ধরেছেন। প্রিয়া পালের বুক ফুলিয়ে উড়ে চলেছেন উজানে।

তখন যদি সে দেখে আরেক নৌকায় তিনজন মাল্লা হাল বৈঠা মেরে মেরে নেয়ে-ভিজে কাঁই হয়ে যাচ্ছে, এক বিঘৎ এগুতে পারছে না, পাল নেই বলে, তখন সে চীৎকার করে তাদের বলে, 'হালের বলদ বিক্রি কর, পালের গাই বেচে দে'—বাকিটা আর বলে না। সবাই জানে। তার মানে ঐ পয়সা দিয়ে পাল কেন।'

টেটেনদি উপস্থিত অর্থাভাবে। এটা সেটা বেচছে। নবীন হাদিশের আশায় শুধোলে, 'আপনি কি বেচলেন?' ইঙ্গিতটা বড় রূঢ়।

'মর্নিং সুট, ঈভনিং জ্যাকেট—'

বড়দা পিচভরা মুখ আকাশ পানে তুলে বললে, 'ভালো করেন-নি। এই আমি কেদার-বদ্রী হয়ে এলুম। পথেই যত বাহার—দেবতা দেখতে এমন কিছু না, কিন্তু যখন সাঁঝের ঝোঁকে ঈভনিং জ্যাকেটটি পরেন তখন দেখায় লাভ্‌লি।'

বিগ্রহের ঈভনিং জ্যাকেট! ওঃ, বুঝেছি। ঠাকুরের যখন সন্ধ্যায় সিঁদুর চন্দন দিয়ে শৃংগার করানো হয়। সেইটে বড়দার ভাষায় ঈভনিং জ্যাকেট পরা। বুঝতে সময় লেগেছে। দিল্লীতে তিন বছর থেকে থেকে আক্কেল-বুদ্ধি ভোঁতা মেরে গিয়েছে।

টেটেনদি শুধলে, 'আর গার্ড অব অনার পেলেন বুঝি সেই ঈভনিং জ্যাকেটের পয়সার মর্গানেটিক টিপ্‌স্‌ দিয়ে?' টেটেন ইংরিজীতে এম-এ। লাতিন শব্দের ইটের থান মারে।

অজনদা বললে, 'সে সব দিন গেছে রে টেটেন, তুই জানিস নে। টিপ্‌স্‌ দিলে তোকে খাতির করলে করতেও পারে, কিন্তু না দিয়ে তুই যদি এম-পি টেম-পি হবার ভাণ করতে পারিস অর্থাৎ ভি আই পি টি আই পি—'

মশাদা আলট্রা ডিমোক্রেট। বাধা দিয়ে বললে, 'এই ভি আই পি কথাটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিল জানেন, চাচা? লোকটা নিশ্চয়ই জন্মদাস ছিল। ভি আই পি যদি কেউ থাকে তবে সে মুটে, জুতা-বুরুশওলা—সরকারের এক পয়সা নেয় না, সরকারের গাড়ি মুফতে চড়ে না—'

আমি বললুম, 'আমি টিপ্‌স্‌ দি নি। শোন।'

পালের বলদ বিক্রি করে তো অ্যারকোচে চাপলুম। দিল্লী চিরতরে ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে দিল্লীর খানদানী ইয়ারদোস্তরা গাড়িতে বিস্তর খাবার-দাবার তুলে দিলে। বিরয়ানী, মুরগী মুসল্লম থেকে মিঠা টুকড়া মোরব্বা ইস্তেক। চারটে টিফিন কেরিয়ার ভর্তি। দুজন তো এলেন কানপুর অবধি। তাঁরা আবার দোস্তী পাকাতে

ওস্তাদ। কোচের প্রায় সবাই জড়ো হল আমাদের কুপেতে। শুরু হল মুশাইরা, বয়েৎ-বাজি। তারপর নবাবী খানাপিনা। স্টুয়ার্ড সোডা সাপ্লাই করতে করতে কাহিল হয়ে গেল।

রাত বারোটার সময় যখন যে যার কোঠে ফিরে গেছেন, আমি একা, তখন দেখি স্টুয়ার্ড। পিছনে তারই দলের দু'তিনজন। ভাবলুম, লোকগুলো বিস্তর খেটেছে—এই বেলাই টিপস্‌টা দিয়ে দি। কিন্তু তার পূর্বেই সে ডবল সেলাম করে শুধালে, "হুজুর, আপ তো ডক্টর হৈ?" গোয়ানীজ টোয়ানীজ হবে—'ডক্টরই' বলে-ছিল। আমি না ভেবেই বললুম, "হ্যাঁ।" তখন বিস্তর কাঁচুমাচু হয়ে, এন্তের ঢোক গিলে, ঘাড়ের চুল ছিঁড়ে প্রায় ক্লীন শেভ করে বললে, "হুজুর যদি কিছু না মনে করেন—"

আমি বললুম, "কী আপদ! বলেই ফেলো না!"

বহু কষ্টে বোঝালে, তার মেটের ভয়ঙ্কর জ্বর, বেহদ্দ বেহুশ, এই যায় কি তেই যায়। হুজুরের যদি দয়া হয়, হুজুর মেহেরবান।

প্রথমটায় আমি বুঝতে পারিনি। বললুম, "বড়ী আফসোস কী বাৎ, কিন্তু আমি কি করবো?"

এবারে সে তার সর্বশরীর বাং মাছের মত মোচড়াতে আরম্ভ করলে! যেন জ্বরটা তারই! বললে, "আপনি তো স্যার, ডক্টর।"

তখন আমার কানে জল গেল। বিরক্ত হয়ে বললুম, "আমি জ্বর সারাই কে বললে?"

লোকটা ভয় পেয়েছে। অথচ আপন কাজ উদ্ধার করতে চায় বলে মেলা তর্ক করে আমাকে চটাতেও চায় না। বললে "এই তো রিজার্ভেশন কার্ডে লেখা রয়েছে, হুজুর।"

এ দুনিয়ায় 'আলী' নামটা বাঙলা দেশে 'কেষ্টা' নামটার মতই বিরল। গুবলেট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমার আপিস বার্থ রিজার্ভ করার সময় ডক্টরটি জুড়ে দিয়েছিলেন। সেইটেই এখন কাল হল।

আমি সবিনয় বললুম, "সে অন্য ডাক্তার।"

বোধ হয় ভুল করলুম। কারণ এর পর দেখি স্টুয়ার্ডের সাঙ্গোপাঙ্গরা তার পিছন থেকে মাসিকপত্রের উপন্যাসের মত 'ক্রমশ প্রকাশ্য' হচ্ছে। সক্কলেরই হাত জোড় করা। হুবহু মোগল পেন্টিংয়ের দরবারের মত। অবশ্য মুখের ভাব;—আসামীর সনাক্তকরণ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে, এইবারে সাক্ষীশাবুদ-দলিল-দস্তাবেজ আরম্ভ হবে।

আমি অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি অন্য ডক্টর। তারা তর্ক করতে চায় না, কিন্তু জানতে চায়, তবে কিসের? ডক্টর অব ফিলসফি এদের বোঝাই কি প্রকারে? শেষটায় বললুম, "দেমাগ সাফ করনেকা ডাক্‌টর—অর্থাৎ মগজ সাফ করার ডাক্তার।" শুনেছি, দর্শন অধ্যয়ন করলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়, অবশ্য আমার বিশ্বাস বিপরীত।'

রাসা রোড থেকে গাড়িহাট পর্যন্ত তাবৎ হাজরা রোড এ-কথায় আনন্দে সায় দিলে। কথায় বলে 'দশের মুখ খুদার তবলা,' কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে উল্লাস বোধ করলুম না। যাক্ গে।

'এই 'দেমাগ সাফ করাটা' গিলতে স্টুয়ার্ডগোষ্ঠীর সময় লেগেছিল। শেষটায় স্বয়ং স্টুয়ার্ডই হালে পানি পেল। ভয় পেয়ে বললে, "না, হুজুর, মেটের মাথা খারাপ নয়।"

ও হরি! এরা ভেবেছে, আমি পাগলের ডাক্তার।

টেটেনদি বললে, 'সাইকায়াট্রি‌স্‌ট্!'

আমি বললুম কচু। মেড্‌সিন না পড়েও ঐ কর্ম করা যায়। সেটা ওরা বুঝলে তো আমি বেঁচে যেতুম। তা নয়। ওরা ফিসফিস করছে, আর সব মেলা ব্যামো সারানোর পর আমি পাগল সারাতে মন দিয়েছি—ঐ কর্ম সব চেয়ে কঠিন বলে। পাগল সারাতে পারে, আর জ্বর সারাতে পারে না। হুঁঃ! 'হাতী' বানান

করতে পারে আর 'পিপীলিকা' পারে না—হাতী কত বিরাট আর পিপীলিকা কত ছোট—ঐ গোছ যুক্তি।

কিংবা বলতে পারো, ছোট বিপদ এড়াতে গিয়ে পড়লুম বড় বিপদে। সেই যে কোন্ সুবুদ্ধিমান বৃষ্টি এড়াবার জন্য ডুব দিয়েছিল পুকুরে।

তা সে যাকগে। ওরা আমাকে বিধান ডাক্তার, মানুষের ডাক্তার, পাগলের ডাক্তার, কুকুরের ডাক্তার, যা-খুশী ভাবুক, আমার তাতে থোড়াই এসে যায়।

কিন্তু ঐ বিধান ডাক্তার নিয়েই লাগল গোলমাল। ওরা ভেবেছে আমি বিধানবাবুর চেয়েও বড় ডাক্তার। কিছুটা আমায় শুনিয়ে, কিছুটা নিজেদের ভিতর তাদের মধ্যে যেন নিলাম ডাকাডাকি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আমার দক্ষিণা কত! চৌষট্টি না কত থেকে আরম্ভ হয়েছিল শুনতে পাইনি, কিন্তু আমার চোখের সামনেই দেখ তো না দেখ দশ বিশ হাজারে গিয়ে পৌঁচেছে। আর কত রকম যুক্তিই না একে অন্যকে দেখাচ্ছে। অ্যারকণ্ডিশন চড়ি, সে তো ডাল-ভাত। কটা বাক্স, প্যাটরা—সব তাদের মুখস্থ। দামী দামী ডাক্তারির মালপত্র ওদের ভিতরে। সব বিলায়তী, জর্মনি, আরো কত কি!

আমার চেহারা দেখে আমাকে উজবুক মনে হতে পারে, কিন্তু পাষণ্ডের মত চেহারা আমার নয়, সে-কথা আমার মা আমাকে বলেছে। তবে কেন এরা ভাবছে, আমি একটা আস্ত কসাই, মোটা টাকা না পেলে বরঞ্চ একটা লোককে মরতে দেখব, তবু কড়ে আঙুলটি তুলব না।

আমি বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি ডাক্তারির কিছুই জানিনে, খামখা একটা লোককে কুচিকিৎসায় মারি কোন আক্কেলে?

ওরা চুপ করে যেভাবে আমার দিকে তাকালে তাতে মনে হল

আমি যেন একটি পয়লা নম্বরের গোড়সে। তবে গোড়সে শুধু একটিমাত্র গাঁধীকে খুন করেছিল, আমি করি গণ্ডায় গণ্ডায়।

আমিও চুপ।

শেষটায় তারা শ্লথ মন্থরে পা চালাতে আরম্ভ করলে।

আমার মনে করুণার উদ্রেক হ'ল। আর ঐ করলুম ভুল। যুধিষ্ঠিরের মত খৃষ্ট কোন একটি পাপ করার ফলে যদি কখনো নরকদর্শনে আসেন তবে তাঁকে ঐ একটি উপদেশ দেব, 'মহাশয়, আপনি করুণা করে আর ঐ করুণা করার উদ্দেশটি দেবেন না।'

ওদের বললুম, 'তা ওকে এলাহাবাদে নামিয়ে দাও না'—মনে মনে বললুম, পণ্ডিতজীরও নিশ্চয়ই গণ্ডাকয়েক অনারারি ডক্টরেট আছে।

এক লম্ফে সবাই আবার আমার দোরের সামনে। এককণ্ঠে সবাই বলে, 'এলাহাবাদ তো পিছনে ফেলে এসেছি।'

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, হাওড়া পর্যন্ত তা হলে তো এর কোনো গতি নেই। তখন আরো মনে পড়ল, বছর তিনেক পূর্বে আমার ফ্লু হওয়াতে এক সহৃদয় বন্ধু আমাকে এক শিশি ফ্লু টেব-লেট দিয়ে যান; আমি ভালো করেই জানতুম, ফ্লু ওষুধে সারে না, তাই সে ওষুধ তেমনি পড়ে ছিল। দিল্লী ছাড়ার সময় আমার সময় ছিল না বলে চাকরকে বলেছিলুম, ঘরের তাবৎ মাল যেন প্যাক করে দেয়। সেই কারণেই দুনিয়ার যত আবর্জনায় ভর্তি দু' গণ্ডা বাক্সোপ্যাটরা। ঘাঁটবে কে, খুঁজে পাবেন কোন হনুমান?

তারই ইঙ্গিত দিয়ে করলুম দুই নম্বরের ভুল—যদিও আসলে সেইটেই পয়লানম্বরী ভুল। সঙ্গে সঙ্গে আমার আটটা বাক্স করিডোরে সারি বেঁধে সাজানো হল—আমি বাধা দিতে না দিতেই। তখন নাচার হয়ে সেই শিশিটার বর্ণনা দিলুম।

পুলিনবিহারী সেনের বাড়ি এক ভোরে সার্চ হয়েছিল। আমি সে রাত্রে তার সঙ্গে ছিলুম বলে স্বচক্ষে দেখেছি পুলিশ কি রকম চিরুনি চালায় টুথব্রাশের উপর—তার থেকে কিছু বেরোয় কি না, সেই আশায়। মায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এদের কাছ থেকে তালিম নিয়ে যেতে পারত কি করে সার্চ চালাতে হয়।'

আড্ডার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'বল দেখি ভাইরা সব, তিন বছরের প্রবাসে মানুষের কোন্ না দশ বিশটা ওষুধের শিশি জড় হয়। তারই এক-একটা বেরয় আর তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। ভাবখানা,—তবে না বলছিলেন চাঁদ তিনি ডাক্তার নন। আর ইংরিজী পড়তে জানে না বলে লাইটার ফ্লুইডকে ভাবে ওষুধ, ফেন্‌সি গঁদের শিশিকে ভাবে ওষুধ, সেন্টের শিশিকে ভাবে ওষুধ—একমাত্র সসের শিশিকে ওষুধ ভাবেনি—রেস্তোরাঁকারে কাজ করে বলে।

ওষুধের শিশি তো আর রাসবিহারী বোস নন যে জাপান পালিয়ে যাবেন। ধরা পড়লেন। বমালসুদ্ধ গ্রেফ্‌তার—'

অজন বললে, 'এই 'বমালসুদ্ধ' কথাটা কি ভুল নয়? 'ব' মানেই তো 'সুদ্ধ', ইংরেজীতে যাকে বলে 'উইথ'। উইথ মাল গ্রেফতার। আবার সুদ্ধ কেন? হয় হবে 'বমাল গ্রেফতার', না হয় হবে 'মালসুদ্ধ গ্রেফতার'। যেমন বলি 'বহাল তবিয়তে' আছি, 'বেহালসুদ্ধ তবিয়তে আছি' তো বলিনে।'

মশাদা বললেন, 'রবিঠাকুর ব্যবহার করেছেন।'

অজনদা চটে বললে, 'তিনি তো দক্ষিণ আমেরিকায় বসে কবিতায় লিখলেন, আকাশে সপ্তর্ষি উঠলো। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কি সপ্তর্ষি দেখা যায়? আরো কি যেন আছে? হ্যাঁ—'বেতসের বাঁশী'—বেতস মানে তো বেত। বেত দিয়ে বাঁশী হতে কখনো দেখেছিস?

টেটেনদি অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েছে। বললে, 'যত সব বেরসিক।'

বড়দা সদুপদেশ দিলেন, 'সে না হয় পণ্ডিত মশাইকে পরে শুধনো যাবে, কোন্‌টা ঠিক। উপস্থিত তোদের বলে দিচ্ছি, রবিঠাকুরের সেন্টেনারি আসছে। এখন বছর দুই এসব কথা বলেছিস কি পাড়ার ছেলেরা মারবে।'

মুকুলদি উঠে চলে যাচ্ছে দেখে সবাই হন্তদন্ত হয়ে বললে, 'বলুন, চাচা, তারপর কি হল।' মুকুলদিকে কে না সমীহ করে। ভঁাড়ারের চাবি তার হাতে।

আমি বললুম, 'ওযুধটা বেরুলে পর আমি বললুম, "এরই দুটি গুলি খাইয়ে দাও।" মনে মনে বললুম, "এতে তার ভালো-মন্দ কিস্‌সুটি হবে না—হাওড়া গিয়ে যা হবার তাই হবে।"

'নিশ্চন্ত মনে ঘুমুতে গেলুম। ভাবলুম, আপদ গেছে। ঐ করলুম আরেক ভুল।

পরদিন সকালে বর্ধমানে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমার কুপের সামনে একপাল লোক একসারি কাপড়ে ঢাকা ট্রে নিয়ে হাজির। ভাই, তোরা যদি থাকতি—রুটি-মাখন-মমলেট বাদ দে—ফ্রাঙ্কফুর্টার সসেজ, মালাবারের টিনের চিংড়ি, ইস্তেক মুসলমানী কাবাব পরোটা।'

আমার ভ্রূকুটিকুটিল নয়ন তারা লক্ষ্যই করলে না। সমস্বরে চেঁচিয়ে বললে, 'সেরে গেছে, হুজুর, একদম সেরে গেছে।'

আমি বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। বললুম, 'কে?'

সবাই প্রথমটায় থ মেরে পরে বললে, 'ঐ যে মেট।' আর যেভাবে তাকালে তাতে মনে হল ওরা যেন বলতে চায়, ডাক্তারগুলো কি বেদরদ চামার—রুগীর কি হল না হল থোড়াই পরোয়া করে—ইস্তেক কে রুগী সেও ভুলে যায়।

স্টুয়ার্ড সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'সকালে উঠেই তিনখানা ডবল রুটি

খেয়েছে। দু পট চা। আমরা বারণ করিনি। আপনি তো রয়েছেন। আর ভাবনা কি?'

আমি মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম।

অজনটা পেটুক। বললে, 'তা বেশ, তা বেশ। ব্রেকফাস্টটা ভালো করে খেয়ে নিলেই পারতেন।'

আমি বললুম, 'দেখ অজন, আস্ত একটা বুজরুক পেলি নাকি আমাকে—পেশাদার গুরু-মুর্শীদরা ঐ রকম ধাপ্পা মেরে খায়। আমাকে কি তাই ঠাওরালি?' মশাদা বললে, 'চাচাকে কখন ব্রেকফাস্ট খেতে দেখেছিস—সেইটে হল আসল কারণ।'

টেটেন বললে, 'আপনি থামুন, মশাদা। চাচাকে আর চটাবেন না। বলুন, চাচা।'

আমি বললুম, 'ব্রেকফাস্ট খেলুম না দেখে ওরা ভড়কে গেল—অবশ্য চা দু' কাপ খেয়েছিলুম। ওরা নিঃশব্দে চলে গেল।

হাওড়া পৌঁছবার পূর্বে চীফ স্টুয়ার্ডকে ডেকে বললুম, "এই নাও চায়ের এক টাকা, আর তোমাদের টিপ্‌স্ চার টাকা।"

স্টুয়ার্ড ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তার পিছনে একটা অচেনা চেহারার লোক ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে—পরে জানলুম ঐ লোকটাই মেট, আমাকে সেলাম জানাতে এসেছিল—তারপর ডুকরে বললে, "আমরা গরীব, আপনার ফীজ দিতে পারলুম না, আর আপনি উল্টে দিচ্ছেন বখশিশ্।"

আমি বিরক্ত হয়ে সব কটাকে বের করে দিয়ে কুপের দরজা বন্ধ করে দিলুম। তারপর তোরা তো দেখলি আমাকে প্ল্যাটফর্মে গার্ড অব অনার দিলে।'

বলে গুম হয়ে বসে রইলুম।

ঘন্টুদা একটু মুরুব্বীর ঢঙে কথা কয়। বললে, 'এতে আপনি অত চটছেন কেন? আপনার ওষুধেই সারুক আর নিজের

থেকেই সারুক, আপনার মন খামখা চঞ্চল করছেন কেন?

আমি উষ্মার সঙ্গে বললুম, 'তোদের মত আকাট নিরেট গবেট আমি ইহজন্মে পূর্বজন্মে, জন্মে-জন্মে কখনো দেখিনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ওদের মুখের উপর কৃতজ্ঞতা মাখা ছিল বটে—যার উপর হক্ক অবশ্য আমার নেই—তার পিছনে ছিল লেখা স্নব। অর্থাৎ আমি গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করিনে, সেটা এড়াবার জন্য মিথ্যে কথা বলতেও তৈরী—অথচ আমি যে হাত উপু করলেই ওদের পর্বত সেটা সুপ্রমাণ হয়ে গেল। সোজা বাঙলায় স্নব, ক্যাডও বলতে পারিস—'

আমার কণ্ঠ তখন পর্দার পর পর্দা চড়েই যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি জনা পাঁচেক লোক আমাদের বাড়ির নেম-প্লেট পড়ছে। লীডার সেই ব্যাটা স্টুয়ার্ড। আমি আঁতকে উঠলুম। কিন্তু ঠিকানা পেল কি করে? ওঃ! লাগেজগুলোর উপর নাম-ঠিকানা সাঁটা ছিল। অবশ্য বাড়ির নেম-প্লেটে আমার নাম নেই।

আমি বৈঠকখানায় গা ঢাকা দেবার পূর্বে বললুম, 'ঐ সব মালরা আসছে! ওদের একটু বুঝিয়ে দে না, ভাইরা সব, চাচা-জানরা আমার, যে আমি ডাক্তার নই। তোদের কথা তো বিশ্বাস করবে।'

আড়াল থেকে অনিচ্ছায় নিম্নলিখিত কথোপকথন কর্ণে প্রবেশ করল।

'এটা ডাক্তার সাহেব অমুকের বাড়ি?'

অজনের গলা: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'—ঐ ঢাউস বাড়ি আমার নয়।

'নেম-প্লেটে নাম না দেখে ভাবলুম, কি জানি—'

বাধা দিয়ে মশার গলা: 'আরে নাম থাকলে কি আর রক্ষে ছিল। ছিঁড়ে ফেলতো না দুনিয়ার যত সব রুগী টুকরো টুকরো করে।'

একাধিক গদগদ কণ্ঠস্বর: 'তা হুজুর আর কি বলবেন, আমরা কি জানিনে? এই মোতীর জ্বরটা বড্ডই পাজী। একবার ধরলে দশদিনের কমে—'

অন্য কণ্ঠ: 'বিশদিনের কমে ছাড়ে না। আর ডাক্তার সায়েবের দুটি গুলিতেই—'

আরেক কণ্ঠ—বোধহয় স্টুয়ার্ডের—'কিছু যদি মনে না করেন, ওঁর ফীজ কত?'

অজনের টেনে টেনে বলা: 'তা—তা—তা, দেড়, দুই—'

'দু শ? বাপ্।'

'হাজার—হাজার, শ নয়।'

নিশ্চুপ।

মশার গলা: 'অবশ্য যখন বাইরে যান ঐ যে, মাসখানেক আগে রামপুরের নবাবের ছেলে এসে তাঁকে জোর করে নিয়ে গেল—স্পেশাল ট্রেনে—তখন ত্রিশ হাজার না কত—বল না ঘণ্টু তুই তো সঙ্গে ছিলি—'

ভাবছি এ রকটা ছাড়ব।

॥ কর্নেল ॥

যুদ্ধের পূর্বে লণ্ডনে অগুনতি ভারতীয় নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি করত। তাদের জন্য হোটেল, বোর্ডিং হৌস তো ছিলই, ডালরুটি, মাছ-ভাত খাওয়ার জন্য রেস্তোরাঁও ছিল প্রয়োজনের চেয়ে অধিক।

বাদ বাকি সমস্ত কন্টিনেন্টে ছিল মাত্র দুটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্যারিসের র‍্যু্য সমোরারের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও বার্লিনের 'হিন্দুস্থান হৌস'।

লণ্ডন ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে উদাসীন কিন্তু বার্লিন ভারতীয়দের খাতির করত। তাই অর্থাভাব সত্ত্বেও 'হিন্দুস্থান হৌস' কায়ক্লেশে যুদ্ধ লাগা পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল। একদিক দেখতে গেলে 'হিন্দুস্থান হৌস' নাৎসি আন্দোলনের চেয়েও প্রাচীন কারণ ১৯১৯-এ হৌসের যখন পত্তন হয় তখনো হিটলার বার্লিনে কল্কে পান নি।

সেই 'হিন্দুস্থান হৌসে'র এক কোণে বাঙালীদের একটা আড্ডা বসত। সে-আড্ডার ভাষাবিদ সূয্যি রায়, লেডি-কিলার পুলিন সরকার, বেটোফেনজ্ঞ মদনমোহন গোস্বামী বার্লিন সমাজের অশোক-স্তম্ভ কুতুব মিনার হয়ে বিরাজ করতেন। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা। 'হিন্দুস্থান হৌসে'র ভিতরে বাহিরে তার প্রতিপত্তি কতটা তা নিয়ে আমরা কখনো আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করিনি কারণ চাচা ছিলেন বয়সে সকলের চেয়ে বড়, দানে খয়রাতে হাতিম-তাঈ আর সলা-পরামর্শে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

এঁদের সকলকেই লুফে নেবার জন্য বার্লিনের বিস্তর ড্রইং-রুম খোলা থাকা সত্ত্বেও এঁরা সুবিধে পেলেই 'হিন্দুস্থান হৌসে' এসে আড্ডা জমাতেন। এ-স্বভাবটাকে বাঙালীর দোষ এবং গুণ দুইই বলা যেতে পারে।

আড্ডা জমেছে। সূয্যি রায় চুক্‌চুক্ করে বিয়ার খাচ্ছেন। লেডি-কিলার পুলিন সরকার চেস্টনাট্ ব্রাউন আর ব্রুনেট্ চুলের তফাৎটা ঠিক কোন জায়গায় তাই নিয়ে একখানা থিসিস ছাড়ছে, চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে আপন ভাবনা ভেবে যাচ্ছেন এমন সময় আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া সদস্য, রায়ের 'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে', গ্রাম-সম্পর্কে ভাগ্নে গোলাম মৌলা এসে তার মামার পাশে বসল। তার চোখে মুখে অদ্ভুত বিহ্বলতা—লাস্ট ট্রেন মিস্ করলে কয়েক মিনিটের তরে মানুষ যে-ভাব নিয়ে বোকার মত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকটা সেই রকম।

রায় শুধালেন, 'কি রে, কি হয়েছে? প্রেমে পড়েছিস?'

গোলাম মৌলা বড্ড লাজুক ছেলে। বয়স সতর হয় কি না হয়, বাপ কট্টর খেলাফতি, ছেলেকে কি দেশে কি বিলেতে ইংরেজের আওতায় আসতে দেবেন না বলে সেই অল্প বয়সেই বার্লিন পাঠিয়েছেন। 'সূয্যিমামা' না থাকলে সে বহুকাল আগেই বার্লিন ছেড়ে পালাত। কথা কয় কম, আর বড়দের ফাইফরমাস করে দেয় অনুরোধ বা আদেশ করার আগেই।

বলল, 'আমার ল্যাণ্ডলেডি আর তার মেয়েতে কি ঝগড়াটাই না লেগেছে যদি দেখতেন। মা নাচে যাচ্ছে, কিছুতেই মেয়েকে নিয়ে যাবে না। মেয়ে বলছে যাবেই।'

রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়ের বয়স কত রে?'

'চল্লিশ হয়নি বোধ হয়।'

'মেয়ের ?'

'আঠারো হবে।'

রায় বললেন, 'তাই বল। এতে তোর এত বেকুব বনার কি আছে রে? মা মেয়ে যদি এক সঙ্গে নাচে যায় তবে মায়ের বয়স ভাঁড়াতে অসুবিধা হবে না ?'

মৌলা বললে, 'কি ঘেন্না! মেয়েটাও দেমাক করে বলছিল, সে থাকলে নাকি মায়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। আমি ভাবলুম, রাগের মাথায় বলছে, কিন্তু কি ঘেন্না। মায়ে মেয়ে এই নিয়ে লড়াই!' মৌলার বিহ্বলতা কেটে গিয়েছে আর তার জায়গায় দেখা দিয়েছে তেতো তেতো ভাব।

আড্ডা তর্কাতর্কির বিষয় পেয়ে যেন রথের নারকোলের উপর লাফিয়ে পড়ল। একদল বলে, বাচ্চার জন্য মায়ের ভালবাসা অনুন্নত সমাজেই পাওয়া যায় বেশী, অন্য দল বলে ভারতের একান্ন পরিবার সভ্যতার পরাকাষ্ঠা আর একান্ন পরিবার খাড়া আছে মা-জননীদের দয়ামায়ার উপর। লেডি-কিলার সরকারকে জর্মনরা বলত 'Schuerzenjaeger' অর্থাৎ 'এপ্রন-শিকারী', কাজেই সে যে মা মেয়ে সক্কলের পক্ষ নিয়ে লড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি, আর গোঁসাই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের মা যশোদার কাছে মা-মেরির মাদন্নারূপ নিতান্ত পানসে।

রায় তর্কে যোগ দেননি। কথা কাটাকাটি কমলে পরে বললেন, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? হবে হবে, কলকাতা বোম্বাই সর্বত্রই আস্তে আস্তে মায়ে মেয়ে রেষারেষি আরম্ভ হবে।'

তখন চাচা চোখ মেললেন। বললেন, 'সে কি হে রায় সায়েব? তুমিও একথা বললে? তার চেয়ে কথাটা পাল্‌টে দিয়ে বলো না কেন, জর্মনিতেও একদিন আর এ-লড়াই থাকবে না। এখনকার অবস্থা তো আর স্বাভাবিক নয়। বেশীর ভাগ ল্যাণ্ডলেডিই বিধবা,

আর যাদের বয়স ষোলর উপরে তারাই বা বর জোটাবে কোত্থেকে ? আরো বহুদিন ধরে চলবে কুরুক্ষেত্রের শত বিধবার রোদন। ১৪—১৮টা কুরুক্ষেত্রের চেয়ে কম কোন্ হিসেবে ?'

গোঁসাই বললেন—'কিন্তু—'

চাচা বললেন, 'তবে শোনো।

'কর্নেল ডুটেন্‌হফারের বাড়ি ছাড়ার বৎসর খানেক পরে হঠাৎ আমাকে টাকাপয়সা বাবদে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। তখনকার দিনে বার্লিনে পয়সা কামানো আজকের চেয়েও অনেক বেশী শক্ত ছিল। মনে মনে যখন ভাবছি ধন্নাটা কোন্ চাকরি নিয়ে শুরু করব, অর্থাৎ ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুটে অনুবাদকের, খবরের কাগজে কলামনিস্টের, না ইংরিজী ভাষার প্রাইভেট ট্যুটরের এমন সময়ে ফ্রলাইন ক্লারা ফন্ ব্রাখেলের সঙ্গে দেখা। আমি একটা অত্যন্ত নচ্ছার রেস্তোরাঁ থেকে বেরুচ্ছি, তিনি তাঁর মের্ৎসেডেজ্ হাঁকিয়ে যাচ্ছেন। গাড়িতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট, কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছ নাকি, এরকম প্রলেতারিয়া রেস্তোরাঁয় লবাব-পুত্তুর কি ভেবে ?'

তোমরা জানো, আমাকে 'ক্লাইনার ইডিয়ট' অর্থাৎ 'হাবাগঙ্গারাম' বলার অধিকার ক্লারার আছে।'

আড্ডা ঘাড় নাড়িয়ে যা জানাতে চাইল তার অনুবাদ এককথায়,—'বিলক্ষণ।'

চাচা বললেন, 'ততদিনে আমার জর্মন শেখা হয়ে গিয়েছে। উত্তর দিলুম ডাকসাঁইটে কবিতায়,

'কাইনেন্ ট্রোপ্ ফ্ যেন্ ইন্ বেযার্ মের্,
উন্ট্ ডাস্ বয়টেল শ্লাপ্ উন্ট্ লের্॥

গেলাসেতে নেই এক ফোঁটা মাল আর।
ট্যাঁক ফাঁকা মাঠ, বেবাক পরিষ্কার।'

ক্লারা বললেন, 'পয়সা যদি কামাতে চাও তবে তার বন্দোবস্ত আমি করে দিতে পারি। আমার পরিচিত এক 'হঠাৎ-নবাবের' ছেলের যক্ষ্মা হয়েছে। একজন সঙ্গীর দরকার। খাওয়া থাকা তো পাবেই, মাইনেও দেবে ভালো। ওরা থাকে রাইন-ল্যাণ্ডে। বার্লিনের তুলনায় গরমে সাহারা।'

আমি রাজী হলুম। দু'দিন বাদ টেলিফোনে চাকরি হয়ে গেল। হানোফার হয়ে কলন পৌঁছলুম।'

মৌলা শুধাল, 'যেখান থেকে 'ও দ্য কলন' আসে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দাম এখানে যা, কলনেও তা। তারপর কলনে গাড়ি বদল করে বন্ন্, বন্ন্ থেকে গোডেসবের্গ্। রাইন নদীর পারে। স্টেশনের চেহারাটা দেখেই জানটা তর্ হয়ে গেল। ভারী ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব। ছোট্ট শহরখানির সঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে এক হয়ে আছে। গাছপালায় ভর্তি—বার্লিনের তুলনায় সোঁদর বন।

'হঠাৎ-নবাবই' বটে। না হলে জর্মনির আপন খাসা মের্সেডেজ থাকতে রোল্স্ কিনবে কেন? ড্রাইভার ব্যাটাও উর্দি পরেছে মানওয়ারি জাহাজের এ্যাডমিরালের।

কিন্তু কর্তা-গিন্নীকে দেখে বড় ভালো লাগল। 'হঠাৎ-নবাব' হোক আর যাই হোক আমাকে এগিয়ে নেবার জন্য দেখি দেউড়ির কাছে লনে বসে আছেন। খাতির যত্নটা যা করলেন, আমি যেন কাইজারের বড় ব্যাটা। দু'জনাই ইয়া লাশ—কর্তা বিয়ার খেয়ে খেয়ে, গিন্নী হুইপ্‌ট্‌ ক্রীম গিলে গিলে। কর্তার মাথায় বিপর্যয় টাক আর গিন্নীর পা দু'খানা ফাইলেরিয়ার মত ফুলে গিয়ে আগাগোড়া কোলবালিশের মত একাকার। দু'জনেই কথায় কথায় মুচকি হাসেন—ছোট্ট মুখ দু'খানা তখন চতুর্দিকে গাদা গাদা মাংসের সঙ্গে যেন হাতাহাতি করে কোনোগতিকে আত্মপ্রকাশ করে, এবং সে এতই কম যে তার ভিতর দিয়ে দাঁতের দর্শন মেলে না।

জিরিয়ে জুরিয়ে নেওয়ার পর আমি বললুম, 'এইবার চলুন, আপনাদের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাক।' তখন কর্তা গিন্নীকে ঠেলেন, গিন্নী কর্তাকে। বুঝতে পারলুম ছেলের অসুখে তাঁরা এতই বিহ্বল হয়ে গিয়েছেন যে সামান্যতম কর্তব্যের সামনে দু'জনেই ঘাবড়ে যান—পাছে কোনো ভুল হয়ে যায়, পাছে তাতে করে ছেলের রোগ বেড়ে যায়।

যদি জানা না থাকত যে যক্ষ্মায় ভুগছে তাহলে আমি কার্লকে ওলিম্পিকের জন্য তৈরী হতে উপদেশ দিতুম। কী সুন্দর সুগঠিত দেহ—যেন গ্রীক ভাস্কর শাস্ত্র মিলিয়ে মেপেজুপে প্রত্যেকটি অঙ্গ নির্মাণ করেছেন, কোনো জায়গায় এতটুকু খুঁত ধরা পড়ে না আর সানবাথ নিয়ে নিয়ে গায়ের রঙটি আমাদের দেশের হেমন্তের পাকাধানের রঙ ধরেছে, চোখ দুটি আমাদেরি শরতের আকাশের মত গভীর আসমানি।

ঘরে আরেকটি প্রাণী উপস্থিত ছিল, নিতান্ত সদামাটা চেহারা, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী—রোগীর নার্স। গিন্নী আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদেরি শহর স্টুটগার্টের মেয়ে, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কার্লের সেবার ভাবনা আমাদের এতটুকুও ভাবতে হয় না। আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

'একে নিয়েই আমার অভিজ্ঞতা।'

লেডি-কিলার সরকার বলল, 'কিন্তু বললেন যে নিতান্ত সাদামাটা।'

রায় বললেন, 'চোপ।'

চাচা কোনো কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'অভিজ্ঞতাটা এমনি মর্মন্তুদ যে সেটা আমি চটপট বলে ফেলি। এ জিনিস ফেনিয়ে বলার নয়।

মেয়েটির নাম সিবিলা। প্রথম দর্শনে নার্সদের কায়দামাফিক গম্ভীর সরকারি চেহারা নিয়ে টেম্পারেচারের চার্টের দিকে এমনি

ভাবে তাকিয়েছিল যেন চার্টখানা হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যাবার চেষ্টা করলে সে সেটাকে খপ করে ধরে ফেলবে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই টের পেলুম, সে কার্লকে যত না নিখুঁত সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তার চেয়ে ঢের বেশী প্রাণরস যোগাচ্ছে হাসিখুশী, গালগল্প দিয়ে। সাদামাটা চেহারা—কিন্তু সেটা যতক্ষণ সে অন্যের প্রতি উদাসীন ততক্ষণই—একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে চোখমুখ যেন নাচতে থাকে, ড্যাবডেবে পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যে-রকম ধারা হয়। কারো কথা শোনার সময়ও এমন ভাবে তাকায়, মনে হয় যেন চোখ দিয়ে কথা গিলছে। তার উপর গানের ফোয়ারা তার ছিল অন্তহীন,—গ্যোটে, হাইনে, ম্যোরিকে, র‍্যুকের্টের কথা, বেটোফেন, ব্রামস, শুমান, মেণ্ডেলজোনের সুর দিয়ে গড়া যে-সব গান সে কখনো কার্লের জন্য চেঁচিয়ে, কখনো আপন মনে গুন-গুনিয়ে গেয়েছে তার অর্ধেক ভাণ্ডারও আমি অন্য কোনো এমেচারের গলায় শুনিনি।

কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরেই লক্ষ্য করলুম, কথা বলার মাঝ-খানে সিবিলা আচমকা কেমন ধারা আনমনা হয়ে যায়, খানার টেবিলে হঠাৎ ছুরি কাঁটা রেখে দিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, আর প্রায়ই দেখি অবসর সময়ে রাইনের পারে একা একা বসে ভাবছে। দু-একবার নিতান্ত পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছি—সিবিলা কিন্তু দেখতে পায়নি। ভাবলুম নিশ্চয় প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কখন, আর কার সঙ্গে?

এমন সময় একদিন গিন্নী আমায় খাঁটি খবরটা দিলেন। ভদ্রমহিলা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়েই আমাকে সব কিছু বললেন, কারণ তাঁর স্বামী কার্লের অসুখের ব্যাপারে এমনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে গিন্নী খবরটা তাঁর কাছে ভাঙতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

সিবিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং অবিবাহিতা। পাঁচমাস। আর বেশীদিন চলবে না। পাড়ায় কেলেঙ্কারি রটে যাবে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়নি। আমি গিন্নীকে বললুম, 'সিবিলা চলে গেলেই পারে।'

গিন্নী বললেন, 'যাবে কোথায়, খাবে কি? এ অবস্থায় চাকরি তো অসম্ভব, মাঝখান থেকে নার্সের সার্টিফিকেটটি যাবে।'

আমি বললুম, 'তা হলে কর্তাকে না জানিয়ে উপায় নেই।

গিন্নীর আন্দাজ ভুল; কর্তা খবরটা শুনে দুহাত দিয়ে মাথার চুল ছেঁড়েননি, রেগেমেগে চেল্লাচেল্লিও করেননি। প্রথম ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন, 'সিবিলার সঙ্গে খোলাখুলি কথা-বার্তা না বলে উপায় নেই। কিন্তু আমি মনিব, সে কর্মচারী এবং ব্যাপারটা সঙ্গিন। আপনার মত কেউ যদি মধ্যস্থ থাকে তবে বড় উপকার হয়। অথচ জিনিসটা আপনার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হবে বলে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস পাচ্ছি না।'

আমি রাজী হলুম।

সিবিলা টেবিলের উপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদল। কর্তা গিন্নী দু'জনই খাঁটি লোক, সিবিলাকে এ বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার করা যায় তার উপায় অনুসন্ধান করলেন অনেক, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হল না। তার কারণটাও আমি বুঝতে পারলুম। এদিকে বিচক্ষণ সংসারী লোক পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায় কাবুতে আনার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে গ্যোটে-হাইনের স্নেহ-প্রেমের কবিতায় ভরা, অনুভূতির ভাপে-ঠাসা জালে-পড়া সবৎসা সচকিতা হরিণী। ইনি বলছেন 'পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জাল ছেঁড়ো'; ও বলছে ছোঁড়া-ছুঁড়ি করলে বাচ্চা হয়ত জখম হবে।' ইনি জিজ্ঞেস করেছেন, বাচ্চার বাপ কে?' ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বোঝাচ্ছে, 'তাতে কোনো লাভ নেই, সে বিবাহিত ও অত্যন্ত গরীব।'

বুঝলুম, সিবিলার মনস্থির, সে মা হবেই।

কেঁদে কেঁদে টেবিলের একটা দিক ভিজিয়ে ফেলেছে।'

চাচা স্পর্শকাতর বাঙালী, কাজেই তাঁর গলায় বেদনার আভাস পেয়ে আড্ডার কেউই আশ্চর্য হল না।

চাচা বললেন, 'দেশে আমার বোন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। মা খুশী, বাবা খুশী। দুদিন আগে নির্মমভাবে যে-বোনের চুল ছিঁড়েছি তার জন্যে তখন কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি। তার শরীরের বিশেষ যত্ন নেওয়ার কথা উঠলে সে মিষ্টি হাসে—কি রকম লজ্জা, খুশী আর গর্বে মেশানো। ছোট বোনরা কাঁথা সেলাই করে, আর বাবার বন্ধু বুড়ো কবরেজ মশায় দু'বেলা গলা খাঁকারি দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন।

আর এ মেয়েও তো মা হবে।

থাক সে-সব কথা। শেষটায় স্থির হল যে কিছুই স্থির করবার উপায় নেই। উপস্থিত সিবিলা কাজ করে যাক, যখন নিতান্তই অচল হয়ে পড়বে তখন তাকে নার্সিঙ-হোমে পাঠানো হবে। আমি পরে কর্তাকে বললুম, 'কিন্তু বাচ্চাটার কি গতি হবে সে কথাটা তো কিছু ভাবলেন না।' কর্তা বললেন, 'এখন ভেবে কোনো লাভ নেই। বিপদ আপদ কাটুক, তখন বাচ্চার প্রতি সিবিলার কি মনোভাব সেইটে দেখে ব্যবস্থা করা যাবে।'

প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিবিলা কাজ করেছিল। কিন্তু শেষের দিকে তার গান-গাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার বোন এমনিতে গান গাইত না। সে শেষের দিকে গুন্ গুন্ করতে আরম্ভ করেছিল!

বাচ্চা হল। আহা, যেন একমুঠো জুঁই ফুল!

কিন্তু তখন আরম্ভ হল আসল বিপদ। বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে দিতে সিবিলা কিছুতেই রাজী হয় না। বলে, কোনো

পরিবারে যেন সে আশ্রয় পায়। কিন্তু এরকম পরিবার পাওয়া যায় কোথায়? অনুসন্ধান করলে যে পাওয়া একেবারে অসম্ভব তা নয় কিন্তু জর্মনির সে দুর্দিনে, ইনফ্লেশনের গরমিতে মানুষের বাৎসল্যরস শুকিয়ে গিয়েছে—আর তার চেয়েও বড় কথা, অতটা সময় আমাদের হাতে কই।

রোজ হয় ফোন, নয় চিঠি। নার্সিঙ-হোম্ বলে সিবিলাকে নিয়ে যাও। এখানে বেড্ দখল করে সে শুধু আসন্ন প্রসবাদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

এদিকে কর্তা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, পয়সা দিয়ে এজেন্সির লোককে লাগানো, আপন বন্ধুবান্ধবদের কাছে অনুসন্ধান কিছুই বাদ দেননি। আমাকে পর্যন্ত দু'তিনবার কলন, ড্যুসেলডর্ফ হয়ে আসতে হল। নার্সিঙ-হোমের তাড়া খেয়ে কর্তার ভুঁড়ি গিরে আষ্টেক কমে গেল। কী মুশকিল!

সব কিছু জানতে পেয়ে তখন সিবিলাই এক আজব প্যাঁচ খেলে আমাদের দম ফেলার ফুর্সৎ করে দিল। নার্স তো বটে, এমনি এক বিদঘুটে ব্যামোর খাসা ভাণ করলে যে পাঠশালার মিটমিটে শয়তান আর হলিউডের ভ্যাম্পে মিললেও ফল এর চেয়ে ভালো ওতরাতো না। ক্নুট হামসুন বলেছেন, 'প্রেমে পড়লে বোকা বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়'। সিবিলার মত ভিতরে বাইরে সাদামাটা মেয়ে বাচ্চার মঙ্গলের জন্য ফন্দিবাজ হয়ে উঠলো।

এমন সময় কর্তা—কারবারে যাকে বলে ভালো 'পার্টি'র খবর পেলেন। অগাধ পয়সা, সমাজে উঁচু, শিক্ষিত পরিবার কিন্তু আমাদের এজেণ্ট বলল 'পার্টি—অর্থাৎ ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী—কড়া শর্ত দিয়েছেন যে সিবিলা এবং আমাদের অন্য কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পাবে না, এবং কথা দিতে হবে যে জানবার চেষ্টা

করবে না, যে কারা সিবিলার বাচ্চাকে গ্রহণ করলেন। এ শর্ত কিছু নূতন নয় কারণ কল্পনা করা কিছু অসঙ্গত নয় যে সিবিলা যদি একদিন হঠাৎ তার বাচ্চাকে ফেরত চেয়ে বসে তখন নানা বিপত্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর কিছু না হোক বাচ্চাটা যদি জানতে পেরে যায় তার আসল মা কে তাহলেই তো উৎকট সঙ্কট।

কর্তার মত ব্যবসায়ের পাঁজে পোড়-খাওয়া ঝামাও এ-প্রস্তাব নিয়ে নার্সিঙ-হোমে যাননি। সব কিছু চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন। দু'দিন পরে উত্তর এল, সিবিলা রাজী।

মনস্থির করতে সিবিলার দু'দিন লেগেছিল। সে আটচল্লিশ ঘণ্টা তার কি করে কেটেছিল, জানি না। বাড়িতে আমরা তিনজন নিঃশব্দে লাঞ্চ ডিনার খেয়েছি, একে অন্যে চোখাচোখি হলেই এক-সঙ্গে সিবিলার দ্বিতীয় প্রসব বেদনার কথা ভেবেছি। আইন মানুষকে এক পাপের জন্য সাজা দেয় একবার, সমাজ কতবার, কত বৎসর ধরে দেয় তার সন্ধান কোন কেতাবে লেখা নেই, কোনো বৃহস্পতিও জানেন না।

ট্রাঙ্ক কলে সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি করা হল। কর্তা সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবেন। 'পার্টির' ওয়েট নার্স (ধাই) বাচ্চার জন্য ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করবে। সিবিলা স্টুটগার্টের ট্রেন ধরলে পর কর্তা বাচ্চাটিকে সেই ধাইয়ের হাতে সঁপে দেবেন। 'পার্টি' কড়াকড় জানিয়েছেন, সিবিলা যেন ওয়েট নার্সকেও না দেখতে পায়।

যে দিন সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবার কথা সে-দিন দুপুর বেলা কার্লের গলা দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠল। ছ'মাস ধরে টেম্পারেচর, স্প্যুটাম কাবুতে এসে গিয়েছিল, এ-পি বন্ধ ছিল, তারপর হঠাৎ সাদা দাঁতের উপর কাঁচা রক্তের নিষ্ঠুর ঝিলিমিলি। আমরা তিনজনাই সামনে ছিলাম। কর্তারই কি একটা রসিকতায়

হাসতে গিয়ে ব্যাপারটা ঘটল। ছেলের মন ভালো রাখবার জন্য ভদ্রলোক অনেক ভেবে চিন্তে রসিকতাখানা তৈরী করেছিলেন। অবস্থাটা বোঝো। আমি তাঁকে হাত ধরে নিজের ঘরে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করতে ছুটলুম।

আমাকে কর্তা গিন্নী এতদিন ধরে যে আদর আপ্যায়ন করেছেন তার বদলে যদি সে সন্ধ্যায় আমি কর্তার বদলে সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে না যেতুম তাহলে নিছক নিমক-হারামি হত। হার্ট নিয়ে কর্তা আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। আমি নার্সিঙ হোম যাচ্ছি শুনে আমার হাতে সিবিলার ছ'মাসের জমানো মাইনে দিলেন। গিন্নী নিজের থেকে আরো কিছু, আর আপন হাতে বোনা বাচ্চার জন্য একজোড়া মোজা দিলেন।

গোডেসবের্গ ছোট শহর। কিন্তু নার্সিঙ-হোম থেকে স্টেশন যেতে হলে ছুটি বড় রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হয়। আমি স্টিয়ারিঙে, সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে পিছনে। ইচ্ছে করেই ড্রাইভারকে সঙ্গে নিইনি, এবং ট্রেনটাও বাছা হয়েছে রাত্রের, যাতে করে খামকা বেশী জানাজানি না হয়। তার মাইনে তাকে দিয়েছি; মোজার মোড়ক যখন সে খুলল তখন আমি সে দিকে তাকাইনি।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি—ঝাঁকুনিতে কাঁচা বাচ্চার অনিষ্ট হয় কি না হয় তা তো জানিনে। থেকে থেকে সিবিলা আমার কাঁধের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি ঠিক জানেন যাঁদের বাড়িতে আমার বুবি যাচ্ছে তাঁরা ভালো লোক?' আমি আমার সাধ্যমত তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি আর ভাবছি কর্তা এলেই ভালো হত। তিনি সমস্ত জিনিসটা নিশ্চয়ই আরো গুছিয়ে করতে পারতেন।

সিবিলা একই প্রশ্ন বারে বারে শুধায়, তাঁরা লোক ভালো তো? আমি ভাবছি যদি শুধায় তাঁরা ভালো আমি কি করে

জানলুম তা হলেই তো গেছি। আমার কেন কর্তারও তো সে-সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কিন্তু যখন সিবিলা সে প্রশ্ন একবারও শুধালো না তখন বুঝতে পারলুম তার কাছে অজানার অন্ধকার আধা-আলোর দ্বন্দ্বের চেয়ে অনেক বেশী কাম্য হয়ে উঠেছে। জেরা করলে যদি ধরা পড়ে যায়—যদি ধরা পড়ে যায় যে আমার উত্তরে রয়েছে শুধু ফাঁকি? তখন? তখন সে মুখ ফেরাবে কোন্ দিকে, কোথায় তার সান্ত্বনা?

সিবিলা বলল, 'গাড়ি থামান একটু দয়া করে। ঐ তো খেলনার দোকান। আমার বুবির তো কোনো খেলনা নেই।' তাইতো, কর্তা, আমি দু'জনেই এদিকে একদম খেয়াল করিনি। কিন্তু একমাসের শিশু কি খেলনা বোঝে?

এক গাদা খেলনা নিয়ে সিবিলা গাড়িতে ঢুকল।

দশ পা যেতে না যেতেই সিবিলা বলল, 'ঐ তো জামা কাপড়ের দোকান। বুবির তো ভালো জামা নেই। গাড়ি থামান।' থামালুম। এবার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে সে দোকানে ঢুকলো, জিনিস বয়ে আনতে অসুবিধে হতে পারে ভেবে আমিও সঙ্গে গেলুম।

দোকানি যেটা দেখায় সেটাই কেনে। কোনো বাছবিচার না, দাম জিজ্ঞেস করা না। দোকানি পর্যন্ত কেনার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'বুবির এখন বাড়ন্ত বয়স, জামাগুলো দু'দিনেই ছোট হয়ে যাবে না?'

বলে করলুম পাপ। সিবিলা বলল, 'ঠিকতো', আর কিনতে আরম্ভ করল সব সাইজের জামা, পাতলুন, মোজা, টুপি। আমি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষটায় বললুম, 'ফ্রলাইন সিবিলা, ট্রেনের বেশী দেরী নেই।' সিবিলা বলল, 'চলুন।'

আরো দশ পা। সিবিলা হুকুম করল, 'থামান'।

এবারে কি কিনল ভগবানই জানেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দোকানপাট একটা একটা করে বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে। সিবিলা বলে, 'থামান,' সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ি থেকে নেবে পড়ে আর ছুটে গিয়ে দোকানিকে দরজা বন্ধ করতে বারণ করে। যে দোকান দেখে বন্ধ হচ্ছে, ছুটে যায় সে-দোকানেরই দিকে। ছুটোছুটিতে চুল এলোথেলো হয়ে গিয়েছে, পাগলিনীর মত এদিক ওদিক তাকায়—সে একাই লড়বে সব দোকানির সঙ্গে। কেন? একদিনের তরে তারা দোকানগুলো ছ'মিনিট বেশী খোলা রাখতে পারে না? আমি বার বার অনুনয় করছি, 'ফ্লাইন সিবিলা, বিট্টে বিট্টে, প্লীজ, প্লীজ, জায়েন জী ফেরনুন্‌ফ্‌টিষ্‌, একি করছেন? গাড়ি ধরব কি করে?' সিবিলা কোনো কথায় কান দেয় না। আমার মাথায় কুবুদ্ধি চাপল, ভাবলুম একটু জোরজার করি। বললুম এত সব জিনিসের কি প্রয়োজন?

চকিতের জন্য সিবিলা বাঘিনীর ন্যায় রুখে দাঁড়াল। হুঙ্কার দিয়ে 'কী?' বলেই থেমে গেল। তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে চোখের জল বেরিয়ে এল।'

চাচা বললেন, 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। খোদার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলুম সিবিলার পরীক্ষা সহজ করে দেবার জন্য।'

তারপর আমি বাধা দিইনি। যায় যাক্ দুনিয়ার বেবাক ট্রেন মিস্ হয়ে। বিশ্বসংসার যদি তার জন্য আটকা পড়ে যায় তবে পড়ুক। আমি বাধা দেব না।

বোধ হয় টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। সিবিলা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কাছে আমার আর কোনো পাওনা আছে?' আমি বললুম, 'না, কিন্তু আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি দিতে পারি।' বলব, 'পাঁচটা মার্ক দিন, একখানা আ-বে-ৎসের বই কিনব।'

এক মাসের শিশু বই পড়বে!

গাড়ির পিছনটা জিনিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে আমার পাশে বসল। তার হাতের বেলুন উড়ে এসে আমার স্টিয়ারিঙে বাধা দিচ্ছে। সিবিলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্টেশনে যখন পৌঁছলুম তখন গাড়ি আসতে কয়েক মিনিট বাকি। গোডেসবের্গ ছোট স্টেশন, ডাকগাড়ি দু'মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। আমি বাচ্চাটাকে নেবার জন্য হাত বাড়ালুম, কোনো কথা না বলে। সিবিলা বলল, 'প্ল্যাটফর্মে চলুন, গাড়ি ছাড়লে পর দেব'। আমি কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললুম।

পোর্টারই দেখিয়ে দিল কোন্ জায়গায় দাঁড়ালে সেকেণ্ড ক্লাস ঠিক সামনে পড়বে। আমি সিবিলাকে আরো পঞ্চাশটি মার্ক দিলুম।

সিবিলা সিগনেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের অন্ধকারের মাঝখানে তার দৃষ্টি ডুবে গিয়েছে। তার কোলে বুবি। ভগবানের জুঁই একরাতেই শুকিয়ে যায়, সিবিলার জুঁই যেন অক্ষয় জীবনের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুমুচ্ছে।

সিবিলা আমার হাতে বাচ্চাকে তুলে দিল। এক মুহূর্তের তরে সব কিছু ভুলে গিয়ে বলল, 'আপনি তো বেশ বাচ্চা কোলে নিতে জানেন; আমাদের পুরুষরা তো পারে না।'

আমি আরাম বোধ করলুম। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পোর্টার সিবিলার সুটকেস তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ সিবিলা সেই পাথরের প্ল্যাটফর্মে হাঁটু গেড়ে আমার দু' হাঁটু জড়িয়ে হাহা করে কেঁদে উঠল। সে কান্নায় জল নেই, বাষ্প নেই। বিকৃত কণ্ঠে বলল—

'আমায় কথা দিন, ঈশ্বরের শপথ, কথা দিন আপনি বুবির খবর নেবেন সে ভালো আছে কি না। মা মেরির শপথ,—না, না, মা মেরির না—আপনার মায়ের শপথ, কথা দিন।'

আমি আমার মায়ের নামে শপথ করলুম। 'পার্টি' যা বলে বলুক, যা করে করুক।

পোটার হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। সিবিলাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিল।

গাড়ির গায়ে চলার পূর্বের কাঁপন লেগেছে। এমন সময় আমার আর সিবিলার কামরার মাঝখান দিয়ে একটি মহিলা ধীরে সুস্থে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে ধরে চলে গেলেন। সিবিলা দোরে দাঁড়িয়েছিল, তাদের লক্ষ্য করল কি না বলতে পারিনে, হঠাৎ দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

আমি বাধা দিলুম না।'

॥ নবাব-জাদী ॥

'বিশ্বাস!'

'জী, হুজুর?'

'কি হবে?'

'কী আর হবে।'

ছ বছর বয়স থেকে এই নবাব-বাড়ি দেখে আসছি। সকাল-বেলা বাবার হাত ধরে বেড়াতে বেরতুম, নবাব-বাড়ির পূব দিক দিয়ে। বিরাট পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতুম কী স্বচ্ছ কাক-চক্ষু জল। এদেশে পুকুরমাত্রই পানা-ভরা, কিন্তু এ-পুকুরে কোথাও এতটুকুমাত্র কোনো ভেসে-যাওয়া শুকনো পাতার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আর দেখতুম ঐ দূরে, ওপারে, কারা যেন শান-বাঁধানো ঘাটে নাইছে, কথাবার্তা বলছে নিশ্চয়ই কিন্তু এপারে কোনো শব্দ আসছে না। আর পাড়ে পাড়ে অসংখ্য জারুল গাছ সর্বাঙ্গ বেগনি ফুল পরে নিয়ে দুলছে।

সবসুদ্ধ সাতটা পুকুর ছিল নবাব-বাড়ি ঘিরে। পূবের পুকুরের পার হয়ে আমরা উত্তরের পুকুরে পৌঁছতুম। করে করে বাড়িসুদ্ধ সব কটা পুকুর পরিক্রমা করে আপন বাড়িতে যখন পৌঁছতুম তখন আমি রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

কিন্তু আমার কৌতূহলের ক্লান্তি ছিল না—ঐ যে পুকুর পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে বিরাট বিরাট—চণ্ডীমণ্ডপপানা খড়ের আটচালা, চারচালা, দুচালা ওখানে কি হচ্ছে? আমরা থাকি ছোট বাড়িতে—মাত্র চারখানা ঘর এবং তাদের সব ক'খানাই এদের একটা ঘরে

ঢুকে যেতে পারে। আমাদের জীবন আর ওদের জীবনের ধরন যে এক হতে পারে না সে বিষয়ে আমার মনে একটা আবছা-আবছা ধারণা ছিল। দুই পুকুরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে চওড়া রাস্তা। শেষ হয়েছে বড় বৈঠকখানার সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে এক ল্যাণ্ডো গাড়ি। ঘোড়া কাঁকরের রাস্তায় যে পা ঠুকছে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি এখান থেকে। গাড়ির গা, ঘোড়ার গা থেকে যে সকালের রোদ ঠিকরে পড়ছে সেটা দেখতে পাচ্ছি আরো স্পষ্ট। আর পিছনে দেখছি, আবছা-আবছা বৈঠকখানার বারান্দায় কারা সব হাঁটাহাঁটি নড়াচড়া করছে।

বাবাকে জিজ্ঞেস করতুম, 'এসব কি? এখানে থাকে কারা?'

বাবা ছিলেন কট্টর। শুধু যে আপন ধর্মে অবিচল বিশ্বাস তাই নয়, তাঁর মতে সংসারে মাত্র দুটি রঙ। কালো আর সাদা। মিশ-মিশে কালো আর ধবধবে সাদা। পাপ পাপ, পুণ্য পুণ্য! পাপী যতই বোঝাবার চেষ্টা করুক না কেন, কোন্ নিদারুণ দায়ে পড়ে সে ঐ কর্ম করেছে বাবার কানে সেটা প্রবেশ করতো না। ভালো মন্দয় মিলিয়ে মানুষ গড়া—এটা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মনের এল্‌বামে কোনো হাফটোন্ ছবি ঢুকতে পারতো না। এসব অবশ্য আমি বড় হয়ে পরে বুঝতে পেরেছিলুম।

নবাব-বাড়ির বিলাস-ব্যসন, হয়তো বা অনাচার পাপাচারের খবরও তাঁর কানে গিয়ে পৌঁচেছিল। 'পৌঁচেছিল' ইচ্ছে করেই বলছি, 'প্রবেশ করেনি' নিশ্চয়ই, কারণ কোনো রকমের পাপা-চারের কথা তাঁর সামনে কেউ তুলতে সাহস পেত না, এবং যদি বা মুরুব্বীদের পাতলা কোন একজন একটুখানি ফড়ুক্কিপনার কথা তুলতে চাইতেন, বাবা অমনি, 'ব্যস ব্যস, হয়েছে হয়েছে' বলে থামিয়ে দিয়ে অন্য কথা পাড়তেন।

কাজেই নবাব-বাড়ির ব্যাপারে আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর

আমি পাইনি। বাবার গলা থেকে যে একটা গ-র্-র্-র্ জাতীয় শব্দ তখন বেরতো তার মানে আমি জানতুম—এসব বাজে প্রশ্ন আমায় শুধোসনি।

তার বছরখানেক পরে বাবা গেছেন মফঃস্বলে। আমি সেই সুযোগে সোজা রওয়ানা দিয়েছি নবাব-বাড়ি পানে। রাস্তায় একা চলা অভ্যাস নেই, তার উপর দুই পুকুরের মাঝখানের পথের দু'ধারের নূতন নূতন ফুলের বাহার দেখে আমি তন্ময়, এমন সময় 'ধর ধর, গেল গেল' চীৎকার এবং চোখের দু'হাত সামনে দেখতে পেলুম জুড়ি গাড়ির দুই বিরাট ঘোড়া হঠাৎ থামতে গিয়ে সামনের দু' জোড়া পা আকাশের দিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। তারপর আর জ্ঞান ছিল না।

যখন চৈতন্য হল তখন প্রথমেই নাকে গেল গোলাপজলের মিষ্টি মোলায়েম গন্ধ। চোখ মেলে দেখি, অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মুখ —মেয়েদের। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার বয়েস তখনো আমার হয়নি কিন্তু তবু লক্ষ্য করেছিলুম তাদের মুখে ভীতি আর কৌতূহল। এরা অন্দরমহলের পর্দানশীল কিশোরী তরুণী। বাইরের অনাত্মীয় ছেলে কখনো দেখেনি।

আমার কাছে সে ঘর মায়াপুরী সদৃশ মনে হয়েছিল। কত ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি ফানুস, আমার পরিচিত মক্কা-মদীনার ছবি —কিন্তু কী বিরাট বড়, আর কতো সুন্দর সোনালী চওড়া ফ্রেমে বাঁধা—নীল মখমলের উপর সোনালী হরফে লেখা হজরৎ বড় পীর মুঈন উদ্-দীন চিশতীর নাম, আরো কত কী। আর বিছানাটাই বা কী মজার! একটু নড়তে গেলেই নীচের দিকে নেবে যায়।

মেয়েগুলি যেন এক একটি পরী। তাদের বুড়ী মা-মাসীরাও যেন বুড়ী পরী। তারাও কী সুন্দর! উপরে টানাপাখা বেদম চলছে, তৎসত্ত্বেও গোটা তিনেক মেয়ে হাতপাখা দিয়ে অনবরত

আমাকে পাখা করে যাচ্ছে আর আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে।

পিছনে দাসীদের কলগুঞ্জরনের মাঝখানে শুনতে পেলুম, 'পীরের ছেলে', 'মুর্শীদের ব্যাটা' এই সব বলে আমার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

হঠাৎ এরা সব চলে গেল। ডাক্তার সেনগুপ্ত এসেছেন।

আমার কিছুই হয়নি। হঠাৎ বিকটদর্শন জোড়া-ঘোড়া দেখে ভিরমি গিয়েছিলুম। আমার পরিচয় পেতে এদের কণামাত্র সময় লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ডাক্তার বললেন, 'কিছু হয়নি। আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

বারান্দা থেকে গলা শোনা গেল ঃ 'ল্যাণ্ডোয় করে নিয়ে যায় না যেন। হয়তো ঐ গাড়ি দেখে পীরের ছেলে ভয় পাবে। পালকি-গাড়িতে করে! আর বাতাসার মাকে বল, সঙ্গে যেতে।' বাতাসার মার সঙ্গে অনেক হালুয়া মোরব্বাও দেওয়া হয়েছিল। গাড়ির ভিতর লক্ষ্য করেছিলুম, ছোট্ট সুন্দর একটি আয়না, আর দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ফুলদানিতে কালো গোলাপ। মায়ের সঙ্গে যে ছ্যাকরা-গাড়িতে করে মামাবাড়ি যাই এ তো সে-রকম নয়।

নবাব-বাড়ির সঙ্গে এই আমার প্রথম এবং শেষ পরিচয়।

বাবা ট্র্যান্সফার হওয়াতে আমরা অন্য শহরে চলে গেলুম।

তারপর ঐ শহরের কাজল নদী দিয়ে কত জলই বয়ে গিয়েছে। নদীর উপর লোহার পোল হয়েছে। দূরের রেলগাড়ি পঁচিশ বছর ধরে চলতে চলতে নদীর ওপারে এসে ইস্টিশেন বানিয়ে এপারেরও জলুস বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই গাড়ি ধরেই একদিন পৌঁছলুম আবার সেই শহরে। স্টেশনে আমার আপিসের হেড্‌ক্লার্ক, একাউনটেণ্ট উপস্থিত। বললে, ভালো বাড়িই ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সরকার এত ঘন ঘন আমায় বদলি করেছে যে এখন আর ওসব বাবদে আমার কোনো ঔৎসুক্য বা কৌতূহল নেই।

একদা এ শহরের রাস্তার প্রতিটি গর্ত আমার মুখস্থ ছিল। সাইক্লের রডে বসিয়ে বড়দা আমাকে নিয়ে শহরে চক্কর লাগাতো। প্রতি গর্তে খেতুম ঝাঁকুনি। আজ সে রাস্তাগুলো ফিটফাট। গাঁধীজি আসেন, জিন্না সাহেব আসেন—লাট সায়েব আগেও আসতেন, এখন আসেন ঘন ঘন।

অনেক পাকা বাড়ি হয়েছে। ১৮৯৭-এর ভূমিকম্পে প্রায় সব পাকা বাড়ি ধূলিসাৎ হওয়াতে আমার ছেলেবেলা পর্যন্ত অতি অল্প লোকই পাকা বাড়ি বানাতে সাহস করতো। এতদিনে সে স্মৃতিও ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে হেথা হোথা অনেকগুলো কৃষ্ণচূড়ার গাছ শহরে এক নূতন বাহারের সৃষ্টি করেছে। হলে কি হয়, ফরাসীতে বলে, 'প্ল্য সা শাঁজ, প্ল্য সে লা মেম্ শোজ'—'যতই সে বদলায় ততই তার চেহারা আগের মত দেখায়'—এখানকার সবুজ আর কাঁকরের রাস্তার লালে এমন ছুটো শেড আছে যেগুলো শহরের ছু'রঙা জাতীয় নিশান। হাত দেয় কার সাধ্য।

তবু কেন জানিনে, এই চেনা-অচেনায় মেশানো শহরের ছবি আমার মনে কোনো আনন্দ সঞ্চার করতে পারলো না। চোখ ছুটো বন্ধ করলুম।

ট্যাক্সি থামলো। আমি চোখ মেলে অবাক।

সেই ছেলেবেলায় যে বাড়িতে আমরা থাকতুম, আমার আপিসের লোক ঠিক সেই বাড়িটাই আমার জন্য ভাড়া নিয়েছে। তফাতের মধ্যে শুধু এইটুকু যে দক্ষিণমুখো টিনের ছাতওলা সেই আসল বড় ঘরটা আর নেই; তার বদলে একখানা ছিমছাম দোতলা বিল্ডিং—সবুজ খড়খড়িওলা জানলা আর বাড়িটার রঙ ফিকে আসমানী।

স্মৃতির গামছাটা কে যেন নিঙড়ে নিয়ে চার ফোঁটা চোখের জল বের করে দিলে।

আপিসের লোকজন বিচক্ষণ। আমাকে আমার পুরনো স্মৃতির হাতে ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিল।

রাস্তার দিকে মুখ করে ডেকচেয়ারে শুয়ে তাকিয়ে আছি রাস্তার ওপারের সেই প্রাচীন দিনের আম জাম বাঁশ বেতে ঘেরা বাড়িটার সুপুরিগাছের ডগার দিকে, আর শুনছি ঘুঘুর সেই পুরনো ডাক, 'কেষ্ট ঠাকুর, ওঠো ; কেষ্ট ঠাকুর, ওঠো।'

সিগারেট বের করতে গিয়ে প্রথমটায় হাত পকেটেই থমকে গিয়েছিল—হঠাৎ মনে পড়েছিল, মুরুব্বীদের কেউ যদি দেখে ফেলেন। তখন মনে পড়লো, হায় এ শহরে আমার আর কেউ মুরুব্বী নেই। কোথায় না কারু তোয়াক্কা না করে ভস্ ভস্ করে সগর্বে সিগারেট খেতে পারার আনন্দটা মন ভরে দেবে—বীরু যে রকম প্রথম রেলগাড়িতে চড়ে সঙ্গে শ্বশুর-ভাসুর কেউ নেই বলে পুলকিত হয়েছিল—আমার হল উল্টোটা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলুম, দীঘির-পাড় মহল্লার ওসমান চাচা মেলা চোটপাট করতেন সত্য কিন্তু তাঁর বাগানের লিচু খাওয়ার জন্য খবরও যে পাঠাতেন সেও তো সত্য। তাঁর হাড়-কিপটে জামাই বাগানের তাবৎ লিচু পাইকারকে বিক্রি করার ইঙ্গিত দিলে পর চাচা নাকি জামাইকে—আপন জামাইকে—খড়ম নিয়ে তাড়া করেছিলেন। আজ চাচা যেখানে সেখানে আল্লা নিশ্চয়ই তাঁর জন্যে মাইলকে মাইল জুড়ে লিচুবন তৈরী করে দিয়েছেন।

সেই ছাতা ল্যাম্পটা আর নেই। সন্ধ্যে হতে না হতে বেয়ারা এসে ফটফট করে গোটা তিনেক বিজলি বাতি অলস অবহেলায় জ্বালিয়ে দিলে। মনে পড়লো, সেই প্রাচীন ছাতা ল্যাম্পটা প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের কাছে কী আদরটাই না পেত!

গেটের কাছে দেখি দুজন লোক আমার বারান্দার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন আলোচনা করছে। শেষটায় দেখি

সাহস সঞ্চয় করে দুজনাই কম্পাউণ্ডে ঢুকলো। আমিও এগিয়ে গেলুম। চলার ধরন থেকেই বুঝতে পেরেছি এরা কারা।

আহমদ আলী সুন্দর চাপদাড়ি রেখেছে, আর বিধু চক্রবর্তী সেই প্রাচীন দিনের সাজে—ধুতি-পাঞ্জাবি-উড়ুনি। হাতে সেই রেলি ব্রাদার্সের সনাতন বাঁশের ডাঁটের ছাতা।

আহমদ আলী এগিয়ে এসে বললে, 'পরিচয় দিতে হবে নাকি? পাঠশালে পাশে বসতুম।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম, 'সে তো হতে পারে না আহমদ সাহেব; আমার পাশে এরকম দাড়িওলা কেউ বসতো না।'

বিধু অল্পেতেই হাসতো—সেই ছেলেবেলায়ও। আহমদ আলীকে বললে, 'দেখলি? কি রকম একখানা মাল ছাড়লে। এবার বলবে, 'অন্য পাশে ও রকম নেয়াপাতি ভুঁড়ি নিয়ে কেউ বসতো না'।' বলেই তার নেয়াপাতি ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে হাসি আর থামাতে চায় না।

দুজনাকে পরম সমাদরে বারান্দায় বসালুম।

গড়গড়ায় টান দিয়ে আহমদ আলী বললে, 'জানিস, বিধু, এ বারান্দায় বসে গড়গড়ায় টান দিতে কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হয়। তবু না হয় মেরে কেটে সিগরেটটা বোঝা যায়। বিপাকে ওটাকে পকেটে পুরে নাক টিপেও মারা যায়।' বিধু বললে, 'স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কুঞ্জ খুঁজতেন, কিংবা যেতেন গোপীসহ যমুনার অতল জলে—তাঁর পর্যন্ত মুরব্বীর ভয় ছিল।' তারপর 'রাধামাধব, রাধামাধব' বলে বার দুত্তিন হুঙ্কার ছাড়লে। আমি চোখ টিপতে আহমদ আলী বললে, 'দেখ, বিধে, বয়েস হয়েছে, এবারে ভণ্ডামি ছাড়। কেষ্টঠাকুর অনেক লীলাখেলা দেখিয়েছেন, কিন্তু ঐ ভণ্ডামিটা করেননি কক্‌খনো।'

বিধু পাষণ্ড। আমাদের ধর্মকথায় কান দিলে না।

পুরনো দিনের অনেক কথাবার্তা হল। ওঠবার সময় বিধু কিঞ্চিৎ কিন্তু কিন্তু করে পকেট থেকে একটা বড় সাইজের পানের ডিবে বের করে বললে, 'রাত্তিরে খাস। বউ দিয়েছে। সন্দেশ। তোর তো—'

পুরনো হলেও নূতন বাড়ি। রাত্রে ভালো ঘুম হল না। কত রকম স্বপ্ন যে তালগোল পাকিয়ে আমাকে বিব্রত করে গেলো তার ইয়ত্তা নেই। শুধু একটা স্বপ্ন দেখলুম খুব পরিষ্কার। ঐ বাড়িতে আমার একটি ছোট ভাই মারা যায়। স্বপ্নে দেখলুম, তাকে সাইক্লের রডে বসিয়ে বাড়ির লনে পাক খাচ্ছি আর সে খলখল করে হাসছে।

সেই শেষ স্বপ্ন। ভোরের আলো তখন ফুটি ফুটি করছে। শীতকাল। র‍্যাপারটা জড়িয়ে বারান্দায় বসলুম। কে যায় ঐ রাস্তা দিয়ে হনহন করে? বিধু না? 'আরে ও বিধুশেখর, ও চক্কোত্তী। থামই না।'

ব্রজসুন্দরীকে স্মরণ করতে করতে বিধু বারান্দায় উঠে বললে, 'অবাক করলি। তুই না বেলা দশটার আগে কখনো বিছানা ছাড়িসনে। জীবনে কখনো ফজরের নামাজ পড়েছিস? তা ভাই, আমি চললুম। দেরী হয়ে গিয়েছে। আহমদ আলী বসে আছে। ওকে নিয়ে মর্নিং ওয়াকে যাই। চল না। না না। তোকে আর ড্রেস বদলাতে হবে না। রাস্তায় লোকজন নেই।'

আমি বললুম, 'সে কি রে? বাবার সঙ্গে যখন ভোরে বেড়াতে বেরতুম তখন তো আমাদের এই অজ মহল্লাতেই বুড়া-ছোঁড়ায় গিসগিস করতো।'

বিধু বললে, 'সে সব দিন গেছে। এখনকার লেটেস্ট্ থিয়োরি হচ্ছে, ব্রাহ্মমুহূর্তে যে লক্ষ্মীছাড়া জড়নিদ্রা আসে সেইটেই নাকি সঞ্জীবনী নিদ্রা। যত সব হাড় আলসের দল।'

ঘন কুয়াশা। লাল কাঁকর-ঢালা একফালি আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা দিয়ে তিন জনায় চলেছি। রাস্তার দু'দিকের খালে হয় কচুরিপানা, নয় দুনিয়ার যত লতাপাতা, কচুঘেঁচু আর ঢেঁকি-শাকের মত মাথাবাঁকানো কি সব ফার্ন যার নাম দেওয়ার প্রয়োজন কেউ কখনো অনুভব করেনি। এক ইঞ্চি জায়গা নেই যেখানে কোনো একটু সবুজ-কিছু গজায়নি। এই শীতকালেও। শিউড়ি বিষ্টুপুরের লোক কল্পনাও করতে পারবে না। ওদিকে আবার ওদের তাল, খেজুর, নারকোল গাছ এখানে খুঁজে বের করতে হয়। বদলে রয়েছে, রাস্তার দু'পাশে সুপুরির এভিনিউ। তাদের সাদা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা হিম—যেন লেসে গাঁথা মুক্তোর কাজ।

হঠাৎ ফাঁকায় বেরলুম। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ মন্ত্রবলে যেন কুয়াশা অন্তর্ধান করল। রোদ্দুরটা যেন সন্ধ্যেবেলার কনে-দেখার আলোর মর্নিং এডিশন। বাঁ দিকে নজর যেতে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালুম, এবং সেটা এমনই আচমকা যে আহমদ আলী বিধু চক্কোত্তী একসঙ্গে শুধলো, 'কি হল?'

আমি নিস্পন্দ, নির্বাক।

এই সেই নবাব-বাড়ি?

পানায় পানায় ছয়লাপ হয়ে সব-কটা পুকুর এক হয়ে গিয়েছে। জারুল কৃষ্ণচূড়ায় এভিনিউ কে যেন সমূলে উৎপাটন করে নিয়ে চলে গিয়েছে। এখন সেখানে যে আঁশসেওড়া, আকন্দের ঝোপঝাড় হয়েছে তারা যেন পুকুরগুলোর কচুরিপানার সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। বাড়িগুলোর দিকে চোখ যেতে দেখি, কতকগুলো কাত, কতকগুলোর গোটা দুই চাল উড়ে গিয়ে বেরিয়ে গেছে বাঁশের কাঠামোর পাঁজর, তার উপর বসে আছে সারি সারি পায়রা না ফিঙে ঠাহর করা গেল না, কোথাও বা বিশ্রী নোংরা জাম-ধরা কেরোসিনের টিন দিয়ে চালগুলো মেরামতির চেষ্টা করা হয়েছে,

একটা ঘরের উপরে কাত হয়ে পড়ে আছে ঝড়ে উপড়ে-পড়া একটা আস্ত গাছ—সেটা সরাবার জন্য কারো বোধ হয় প্রয়োজন বোধ হয়নি—আর এখানে ওখানে সর্বত্র জমে আছে আবর্জনার স্তূপ, ঝোপ-ঝাড়ে ভরতি তামাম বাড়িটা। এবং সব চেয়ে মর্মন্তুদ মনে হল, আনাড়ি হাতের একটি আধমরা আধফালি টমাটো খেত দেখে—এই দৈন্য, অবহেলা, লক্ষ্মীছাড়া পরিবেশের মধ্যে কে যেন অনিচ্ছায় অর্ধাবশ হস্তে আধখ্যাচড়া চেষ্টা দিয়েছে একমুঠো খাদ্য সংস্থান করতে। এলোপাতাড়ি কঞ্চির বেড়ার মাঝখান দিয়ে সেখানে একটা ছাগল ঢুকছে।

বিধু বললে, 'কি রে, জ্যান্ত ভূত দেখলি নাকি? আমাদের দেখিয়ে দেনা।'

আমি ততক্ষণে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছি। বললুম, 'কিচ্ছু দেখছিস না?'

'না তো।'

বুঝলুম, নবাব-বাড়ির এ পরিবর্তন তো আর এক দিনে হয়নি যে এরা যারা পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ধরে এখানে বেড়াতে আসছে তারা লক্ষ্য করবে। তাই হেঁয়ালি বাদ দিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলুম, 'নবাব-বাড়ির এ-অবস্থা হল কি করে?'

আহমদ আলী যদিও ঘড়ি ঘড়ি বিধুর মত সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে না তবু দেখলুম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয়েছে তারই। বললে, 'আল্লা যাকে দিয়ে যা করান। কিন্তু ধনদৌলত যায় কি করে সেটা তুই বহু বৎসর শহরে কাটিয়ে এসে আমাদের শুধোচ্ছিস! সেখানে তো শুনেছি, আজ রাজা কাল ফকীর। নিত্যি নিত্যি এবং গণ্ডায় গণ্ডায়। এখানে সব-কিছুই চলে ধীরে ধীরে, তাই ধনী হতে সময় লাগে, আর গরীব হতেও সময় লাগে।'

বিধু দেখলুম, একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। আমার মন তখনো

নবাব বাড়িটার ঐ হৃতশ্রী ছবিটা গ্রহণ করতে পারছে না। বিধু বললে, 'চল, ঐ টিলাটার উপরে। বাবু সেখানে চা পান করেন'—বাবু অর্থাৎ আহমদ আলী।

টিলার উপর ছোট্ট একটি দেউল, কিন্তু বিগ্রহ নেই। কিংবা হয়তো চিতাভস্মের স্মৃতি-মন্দির। দেউলের কোলে একটি ছোট্ট ছত্রী। তারি উপরে বসে আহমদ আলী ঝোলা থেকে চায়ের ফ্লাস্ক বের করলো। বিধুর জন্য লেবু।

আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে আহমদ আলী বললে, 'বিধু বলুক। ওর মা বিশ্বাস বাড়ির মেয়ে।'

আমি বললুম, 'বিশ্বাসরা তো কায়েত হয়।'

বিধু বললে, 'হাতী হয়। বামুন হয়, কায়েত হয়, নমশূদ্র হয়, ডোম-চাঁড়াল ভী হয়। এই তো খবর রাখিস হিন্দুদের। আর আমরা মরি তোদের খবর নিয়ে নিয়ে। ওদিকে আবার গলাগলি, ভাই ভাই! যত সব!'

আমি বললুম, 'কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় যে আবার হিন্দুরা মুসলমানদের কোনো-কিছু জানে না, ওদিকে মুসলমানরা মনোরথ দ্বিতীয়া থেকে আরম্ভ করে রটন্তী পূজো পর্যন্ত ওকিবহাল। তা সে যাকগে।'

বিধু বলাতে আবছা আবছা মনে পড়লো, তার মামার বংশের বিশ্বাসরা অনেক পুরুষ ধরে নবাব-বাড়ির নায়েব।

বিধু কোথায় আরম্ভ করবে, ঠিক যেন বুঝতে পারছিল না। শেষটায় বললে, 'মা আর কি বলবে? জ্যাঠতুতো ভাই, অথচ বয়েসে প্রায় বাপের সমান। তদুপরি তিনি গম্ভীর। তদুপরি বছর পঁচিশ পূর্বে যখন পড়তা বিগড়োতে আরম্ভ করলো সেই থেকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বাড়ি ফেরেন দুপুর রাতে চোরের মত, বেরিয়ে যান ভোরবেলা চোরের মত। মামী নেই, ছেলেপুলে নেই, শুনো দেবে কে?'

আমি শুধালুম, 'আরম্ভ হল কি করে?'

বিধু বললে, 'সে আমি জানি। আমাদের দেশে তখনো ব্যাঙ্ক কাকে বলে লোকে জানতো না।

শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে গোয়ালন্দ স্টীমারে কে নাকি নবাব সায়েবকে বোঝালে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে সুদ দেয়। এমনিতে কেউ নবাব সায়েবকে লগ্নির কারবার করতে বললে তিনি নিশ্চয়ই তাকে হাণ্টার নিয়ে তাড়া করতেন, কিন্তু কোথায় কোন্ কলকাতায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বেনাগালে কাগজ-কলমেই সব-কিছু হয়—ওতে আর আপত্তি কি? কিন্তু মামা আপত্তি করেছিল।

ব্যাঙ্ক শেখালে, শেয়ার কিনলে আরো বেশী লাভ। কিন্তু মামা আপত্তি করেছিল।

নবাব সায়েব শিখলেন, চায়ের বাগান মুনাফা করে শেয়ার-হোল্ডারকে তারই কিছুটা দেয়; অতএব করো চায়ের বাগান। কিন্তু মামা আপত্তি করেছিল।

মামার জীবন-দর্শন বড় সরল। জমিদারের ব্যাটা তুমি জমিদারি করবে। বিলাস করবে, সমঝে-বুঝে ব্যসনও করতে পারো, এবং তার পরও, যদিস্যাৎ, নিতান্তই কিছু বেঁচে যায় তবে তাই দিয়ে কিনবে নূতন জমিদারি। কাছে-পিঠে হল ভালোই, দূর-দরাজে হলেও আপত্তি নেই। মামাকে খুশী করার জন্যই যেন নবাব সায়েব টাকা দিয়ে তাঁর ভাগ্নেকে পাঠালেন মালয় না বার্মায় কোথায় যেন—ওখানে সস্তায় বড় বড় মহল বিক্রি হচ্ছে।

'এদিকে চা-বাগানে নবাব খেলেন মার।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি?'

বিধু বললে, 'একদম। কিন্তু তুই ঠিকই আশ্চর্য হয়েছিস, নেটিভরা তখন সবে চায়ের কারবারে ঢুকেছে। ধুলোমুঠো সোনামুঠো হচ্ছে, অথচ নবাব খেলেন মার। মামা নাকি বলেছিল, নবাবের

ব্যাটা তুমি গিয়েছিলে দাঁড়ি-পাল্লা হাতে করে চা ওজন করে মুদীর সঙ্গে পাল্লা দিতে—বোঝো ঠ্যালা। অবশ্য সামনাসামনি বলেনি—বলেছিল আড়ালে।

তারপর আরম্ভ হল নবাব পরিবারের পতন। চা-বাগানের দেনা শোধ করবার জন্য নবাব সায়েব ঢুকলেন ফটকা বাজারে। কলকাতার জুট আর বোম্বায়ের তুলো। ওদিকে নবাবের ভাগ্নে মারা যাওয়ার পর দেখা গেল বিরাট বিরাট জমিদারি সে কিনেছে বহু জায়গায়, কিন্তু তার আপন নামে, নবাব সায়েবের নামে নয়। ভাগ্নের ছেলের সঙ্গে লাগলো মোকদ্দমা।

তখন আরম্ভ হল জমিদারি বন্ধক দেবার পালা। বিরহামপুরের লক্ষ্মণ পাল তার জন্য তৈরী হয়েছিল। আসতে লাগল কাঁড়া কাঁড়া টাকা এক দোর দিয়ে, বেরিয়ে গেল তিন দোর দিয়ে—ফটকা, মোকদ্দমা, আর কলকাতা-বিলাস। আগে নবাব সাহেবের একমাত্র শখ ছিল হরিণ শিকার। এখন যতই তাঁর টাকার অনটন বাড়তে লাগলো ততই চাপলো ফুর্তিবাজির নেশা। এদিকে নিজে মদ্য স্পর্শ করেন না, আবার শুনি কলকাতায় নাকি ইয়ার-বক্সীদের এক সন্ধ্যায় দশ হাজার টাকার মদ খাইয়েছিলেন। শেম্পেন না কি যেন! কি জিনিস রে ওটা? তুই তো কলকাতায় অনেক কাল ছিলি।'

আমি বললুম, 'দামী ফরাসী মদ। তবে শুনেছি, দ্রব্যগুণও আছে। বেহুঁশকে হুঁশে আনতে হলে নাকি ওর বাড়া জিনিস নেই।'

আহমদ আলী তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, 'লাও! আমি তো শুনেছি, মদ খেয়ে হুঁশিয়ার বেহুঁশ হয়।'

বিধু বৈষ্ণব। আদিরসের বেবাক বাৎ জানে। বললে, 'প্রেমের বেলাও তাই। প্রেমে পড়লে বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়, আর বোকা হয়ে যায় বুদ্ধিমান।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ওসব থাক। নবাব-বাড়ির কথা বলো।'

'হ্যাঁ, নবাব বাড়ির কথাই সব কথার নবাব। বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর একটা আন্তরিক মিল আছে। ওঁর রোক চাপাতে উনি এজমালি স্ত্রীটিকে পর্যন্ত খুইয়ে বসলেন। এঁর তাবৎ সম্পত্তি এঁরই একলার—যদিও পুষ্যে পুষ্যে মহলটি ভরতি—এবং আর কিছু না হোক মেয়েটার তো বিয়ে দিতে হবে। তবু সেই ক্ষয়-ক্ষতি, বিলাস-ব্যসন এবং সর্বগ্রাসী সর্বনাশ থেকে তখন তাঁকে বাঁচায় কে?'

আহমদ আলী বললে,

'এমন অনেক বন্ধু আছে দেয় রে তুলে আশা গাছে
ভালোবেসে নামায় এসে এমন বন্ধু ক'জন আছে?'

বিধু বললে, 'একদম খাঁটি কথা। আমাদের যুধিষ্ঠিরের মৌলা-মুরুব্বী তো কাছে-পিঠেই ছিলেন, আর ভীষ্ম তো সভাস্থলে বসেই। কিন্তু তাঁরাই কি ঠেকাতে পেরেছিলেন তখন তাঁকে?

ওদিকে তিনি হারলেন ভাগ্নের বেটার সঙ্গে মোকদ্দমায়। বিশ্বাস মামা অবশ্য এটা একদিন হতে পারে এই আশঙ্কায় কাগজ-পত্র ঠিকঠাক করে রেখেছিল, কিন্তু নবাব সায়েব মোকদ্দমা জিততে হলে যে এদিক ওদিক একটুখানি ইয়ে করতে হয়, অর্থাৎ মামার কাগজ-পত্র মোতাবেক একটুখানি উনিশ-বিশ করতে হয়, তার সুবিধে নিতে রাজী হলেন না।

ঋণে ঋণে নবাব-বাড়ি যেন চোখের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে যেতে লাগলো। সে দুর্দৈবের কাহিনী আমি কি করে দু'ঘণ্টা, দু'দিন বা দু'মাসে তোকে বলবো—যেটা ঘটেছিল ঝাড়া পঁচিশ বৎসর ধরে, দিনে দিনে পলে পলে।

যে নবাব-বাড়িতে একদিন এত ঘড়া ঘড়া কলসীভরা ঘি মৌজুদ থাকতো, যে গাঁয়ের থেকে আসা দাসী জলের বদলে ভুলে ঘি দিয়ে বদনা ভরে নিয়ে পিছন ফিরতে গিয়েছিল, সেখানে আরেক দিন আরম্ভ হল তেল, তারপর এমন দিনও এল যখন বাড়ির চতুর্দিকে জমে

ওঠা বন থেকে লতা-পাতা কচু-ঘেঁচু যোগাড় করে সেদ্ধ করে খাওয়া। একদিন এই নবাব-বাড়িতে শীতের গোড়ায় যখন গণ্ডায় গণ্ডায় সাটিনের লেপ তৈরী হত তখন তুলোর উপর ঢালা হত কণ্টর কণ্টর আতর—'

আমি বাধা দিয়ে শুধালুম, 'কণ্টর কি রে?'

আহমদ আলী তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, 'দিশী ভাষা বেবাক ভুলে গিয়েছিস! কণ্টর মানে ডিকেণ্টার। চা-বাগিচার সায়েবরা প্রথম এ দেশে আনে।'

বিধু বললে, 'শীতের রাতে শুতে শুতে সবাই শুঁকবেন সেই লেপের ভুরভুরে খুশবাই! শুধু সায়েব বিবিরা না—গোলাম, দয়লা, নওলা পর্যন্ত। সেখানেই শেষটায় ছালার চট দিয়ে শুধু কাঁথার কাজ না, কেউ কেউ নাকি লজ্জা নিবারণও করেছে।

একমাত্র সান্ত্বনার কথা, দুর্দশা চরমে পৌঁছবার পূর্বেই একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সেই শেষ ধার দিয়েছিল লক্ষ্মণ পাল। সেই সঙ্গে সঙ্গে মামাও ঢেলে দিলেন—ঢেলে দিলেন বলা ভুল হল, ছিঁটেফোঁটায় দিলেন তাঁর হিস্সের পৈতৃক সম্পত্তি বেচে তিনি যা যোগাড় করতে পেরেছিলেন। বেশীর ভাগ আগেই গিয়েছিল নবাবের ছোট ছোট হাওলাত শোধ করে বড় বড় ঋণ আনতে।

পুষ্যিরা চতুর্দিকে ছিটকে পড়লো। সামান্য দু'চারজন যাদের অগতির গতি বলেও কোনো গতি ছিল না, তারা ঠিক যেন বাস্তুসাপের মতই বন-বাদড়ে ভরতি বাড়ির আনাচে-কানাচে কাটাতো দিনটা, রাতে বেরতো তাদের ব্যাঙ ইঁদুর অর্থাৎ লতা কচুর জন্য।

এমন সময় নবাবের মস্তকে বজ্রাঘাত। মেয়ে আসছে বাপের বাড়িতে। বিয়ের পর এই প্রথম। সে তো সব জানে—তাঁর কী অবস্থা। সঙ্গে যে মেলা লোকজন আসবে। তিন পুরুষের ভিতর

ব্যাটাছেলে মেয়েছেলের মধ্যে ও-ই তো সবচেয়ে বেশী মাত্রায় বুঝসমঝ নিয়ে জন্মেছিল। সে একি করতে চললো ?

তার দিন তিনেক আগে তোদের মসজিদে মসজিদে শবীনা খতমের পরব হয়ে গিয়েছে। নবাব-বাড়ির পয়সায় ঐ যে পাশের টিলার মসজিদ, সেখানে নবাব সায়েবকে কিছু পাঠাতে হয়। তাঁর হাতে তাঁর আম্মাজান প্রথম মক্তব যাবার দিন বেঁধে দিয়েছিলেন একটি সোনার আশরফীর রক্ষাকবচ। কখনো সেটি হাত থেকে নাবেনি। সেইটি পাঠিয়ে দিলেন মসজিদে।

এই প্রথম নবাব সায়েব নিজে বেরলেন ধারের সন্ধানে। পায়ে হেঁটে।

লক্ষ্মণ পাল পিছনের দরজা দিয়ে পালালো।

মানুষ কি করে যে একদিন এমন অবস্থায় পৌঁছয় যে-দিন সে আর চার আনা পয়সা পর্যন্ত যোগাড় করতে পারে না সে আমি কখনো বুঝতে পারিনি। ছেলেবেলায় মাইকেলের জীবনীতে পড়েছিলুম সেই নবাবের ছেলে মাইকেল—যে কিনা এক দিন আস্ত সোনার মোহর দিয়ে সে যুগে চুল কাটাতেন—তিনি একদিন খয়রাতী হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে চার আনা পয়সা যোগাড় করতে পারেননি। তখন সেটা বিশ্বাস করিনি। আজ করি।'

"বিশ্বাস!"

"জী, হুজুর!"

"কী হবে ?"

"কী আর হবে।"

সেই দিন সকালের গাড়িতে মেয়ের স্টেশনে পৌঁছবার কথা। নবাব বিশ্বাস কেউই সেখানে যাননি।

সেই পায়রার ময়লায় ভরতি বৈঠকখানায় নবাব শুয়ে আছেন ভাঙা ইজিচেয়ারে। মামা সামনে বারান্দায় হেলান দিয়ে মাটিতে বসে।

এমন সময় অতি নিঃশব্দে কে যেন ঘরে ঢুকলো।

মেয়ে। সর্বাঙ্গে দামী গয়না। কিন্তু একা। রিকসায় করে এসেছে। কিন্তু একা।'

বিধু দেখি চুপ করে গিয়ে, নবাব-বাড়ির দিকে পিছন ফিরে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

আমি শুধালুম, 'একা মানে?'

বিধু বললে, 'আমাদের ডিস্‌ট্রিকটের পয়লা স্টেশনে পৌঁছতেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন পাইক-বরকন্দাজদের নাকি নাববার হুকুম দিয়ে বলেছে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার বাপের বাড়িতে যায় এ-রেওয়াজ নাকি তাদের পরিবারে নেই। মেয়ে যাবে ধুলো-পায়ে—একা।

সে রাতে মেয়ে বাজার থেকে হাঁড়িকুঁড়ি এনে বাপকে রেঁধে খাইয়েছিল। ধনীর মেয়ে বেহুলা-ধনী যে রকম নারকোলের খোলে রান্না করে লক্ষীন্দরকে দুপুর রাতে খেতে দিয়েছিল।'

॥ বাঁশী ॥

আজ আর সে শান্তিনিকেতন নেই।

তার মানে এ নয়, গুরুদেব নেই, দিনুবাবু নেই, ক্ষিতিমোহন-বাবু ক্লাস নেন না। সে তো জানা কথা। কোম্পানির রাজত্ব, মহারানীর সরকারই যখন চলে গেল তখন এঁরাও যে শালবীথি থেকে একদিন বিদায় নেবেন, সে তো আমাদের জানাই ছিল; কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, আশ্রমের চেহারাটিও গুরুদেব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

খুলে কই।

তখন আশ্রমের গাছ-পালা ঘর-বাড়ি ছিল অতি কম। গাছের মধ্যে শালবীথি, বকুলতলা, আম্রকুঞ্জ আর আমলকি-সারি। বাস্। হেথা হোথা খানসাতেক ডরমিটরি, অতিথিশালা আর মন্দির। ফিরিস্তি কম্‌প্লিট। তাই তখনকার দিনে আশ্রমের যেখানেই বসো না কেন, দেখতে পেতে দূরদূরান্তব্যাপী, চোখের সীমানা-চৌহদ্দি ছাড়িয়ে—খোয়াইয়ের পর খোয়াই, ডাঙার পর ডাঙা—চতুর্দিকে তেপান্তরী মাঠ। ভোরবেলা সুজ্জিঠাকুরের টিকিটি বেরুনোমাত্র সিটিও আমাদের চোখ এড়াতে পারত না। রাত তেরোটার সময় চাঁদের ডিঙির গলুইখানা ওঠামাত্রই আমরা গেয়ে উঠতুম—'চাঁদ উঠেছিল গগনে।' যাবে কোথায়, চতুর্দিকে বেবাক ফাঁক। আর আজ? গাছে গাছে ছয়লাপ। আম জাম কাঁঠাল খানদানী ঘরানারা তো আছেনই, তার সঙ্গে জুটেছেন যত সব দেশ-বিদেশের নাম-না-জানা কালো নীল হলদে ইয়া-ইয়া

ফুলের গাছ। এখন আশ্রমের অবস্থা কলকাতারই মত। সেখানে পাঁচতলা এমারত সুজ্জি-চন্দর ঢেকে রাখে, হেথায় গাছপালায়।

ওই দূরদূরান্তে, চোখের সীমানার ওপারে তাকিয়ে থাকা ছিল আমাদের বাই। অবশ্য যারা লেখাপড়ায় ভাল ছেলে তারা তাকাত বইয়ের দিকে, আর আমার মত গবেটরা এক হাত দূরের বইয়ের পাতাতে চোখের চৌহদ্দি বন্ধ না রেখে তাকিয়ে থাকত সেই সুদূর বাটের পানে—তাকিয়ে আছে কে তা জানে। গুরুরা, বরঞ্চ একদিন শালতলার শালগাছগুলো নরঃ নরৌ নরাঃ, গজঃ গজৌ গজাঃ উচ্চারণ করে উঠতে পারে কিন্তু আমাদের দ্বারা আর যা হোক, লেখাপড়া হবে না। অন্য ইস্কুল হলে অবশ্য আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত, কিন্তু তাঁরা দরদ দিয়ে বুঝতেন, আমি বাপ-মা-খ্যাদানো ছেলে, এসেছি এখানে, এখান থেকে খেদিয়ে দিলে, হয় যাব ফাঁসি, নয় যাব জেলে।

এই দূরের দিকে তাকিয়ে থাকার নেশা আপনাদের বোঝাই কী প্রকারে? আমি নিজেই যখন সেটা বুঝে উঠতে পারিনি, তখন সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, এ-নেশাটা সাঁওতাল ছোঁড়াদের বিলক্ষণ আছে। আকাশের সুদূর সীমানা খুঁজতে গিয়ে তারা বেরিয়েছিল সাঁজে, তারপর অন্ধকার রাতে পথ হারিয়ে একই জায়গায় সাত শো বার চক্কর খেয়ে পেয়েছে অক্কা। বুড়ো মাঝিরা বলে, পেয়েছিল ভূতে। সে কথা পরে হবে।

আমি শান্তিনিকেতনে আসি ১৯২১ সনে। গাঁইয়া লোক। এখানে এসে কেউ বা নাচে ভরতনৃত্যম্, কেউ বা গায় জয়জয়ন্তী, কেউ বা লেখে মধুমালতী ছন্দে কবিতা, কেউ বা গড়ে নব নটরাজ, কেউ বা করে বাতিক, লেদার-ওয়ার্ক, ফ্রেস্কো, স্টুক্কো, উড-ওয়ার্ক, এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট মেদজো-টিন্‌ট্ আরও কত কী। এক কথায় সবাই শিল্পী, সবাই কলাবৎ।

আমারও বাসনা গেল—শিল্পী হব। আর্টিস্ট হব। ওদিকে তো, লেখাপড়ায় ডডনং, কাজেই যদি শিল্পীদের গোয়ালে কোন গতিকে ভিড়ে যেতে পারি তবে সমাজে আমাকে বেকার বাউণ্ডুলে না বলে বলবে—শিল্পী, কলাবৎ, আর্‌তিস্‌ৎ।

অথচ আমার বাপ-পিতামোর চোদ্দ পুরুষ, কেউ কখনও গাওনা-বাজনার ছায়া মাড়ানো দূরে থাক, দূর থেকে ঝঙ্কার শুনলেই রামদা নিয়ে গাওয়াইয়ার দিকে হানা দিয়েছেন। আমরা কট্টর মুসলমান। কুরানে না হোক আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে গাওনা-বাজনা বারণ, বাঁদর-ওলার ডুগডুগি শুনলে আমাদের প্রাচিত্তির করতে হয়। আমার ঠাকুদ্দাদার বাবা নাকি সেতারের তার দিয়ে সেতারীকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন।

কাজেই প্রথম দিন ব্যালাতে ছড় টানা মাত্রই আশ্রমময় উঠল পরিত্রাহি অট্টরব। কেউ শুধালে, গরু জবাই করেছে কে ; কেউ ছুটলে গুরুদেবের কাছে হিন্দু ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মামদো ভূতের উপদ্রব থামাবার জন্য অনুরোধ করতে। গুরুদেব পড়লেন বিপদে। তাঁর মনে পড়ল আপন ছেলেবেলাকার কাহিনী—তাঁর পিতৃদেব তাঁর প্রথম কবিতা শুনে কী রকম বাঁকা হাসি চেপে ধরেছিলেন। তাই তিনি সে রাত্রে কবিতা লিখলেন,

'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে
বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে ?'

কার হাতে আর দেবেন? দিলেন আমারই হাতে। সবাই বুঝিয়ে বললে, 'ভাই, ব্যালাটা ক্ষান্ত দাও! বাঁশীই বাজাও। কিন্তু দোহাই আশ্রমদেবতার, আশ্রমের বাইরেই রেওয়াজটা কোর।'

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বাঁশী হাতে নিয়ে গেলুম সাঁওতাল-গাঁয়ের দিকে। পশ্চিমাস্য হয়ে, অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধরলুম তোড়ি।

সাঁওতাল-গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে মেলা 'এনকোর,' 'সাধু সাধু' রব কাড়লে।

সুদূর দিক্‌প্রান্তের দিকে, অস্তমান সূর্যের পানে তাকিয়ে আমার মাথায় তখন চাপল সেই বাই, যেটা পূর্বেই আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি—হোথায় যেথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আমাকে সেখানে যেতে হবে।

নেমে পড়লুম খোয়াইয়ে।

গোধূলির আলো ম্লান হয়ে আসছে। তারই লালিমা খোয়াই-য়ের গেরুয়াকে কী রকম যেন মেরুন রঙ মাখিয়ে দিচ্ছে। চতুর্দিকে কী রকম যেন একটা ক্লান্তি আর অবসাদ। আমি সুদূরের নেশায় এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ ঝুপ্ করে অন্ধকার হয়ে গেল।

প্রথমটায় বিপদটা বুঝতে পারলুম না। বুঝলুম মিনিট পাঁচেক পরে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে, উঁচু ঢিপি থেকে গড়গড়িয়ে সর্বাঙ্গ ছড়ে গিয়ে নীচে পড়ে, হঠাৎ উঁচু ঢিপির সঙ্গে আচমকা নাকের ধাক্কা লেগে, কখনও বা কারও অদৃশ্য পায়ে বেমক্কা ল্যাং-খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে।

উঠি আর পড়ি, পড়ি আর উঠি।

দশ মিনিটে সাঁওতাল-গাঁয়ে ফেরার কথা। পনের, পঁচিশ মিনিট, আধঘণ্টাটাক হয়ে গেল, গাঁয়ের কোনও পাত্তাই নেই।

ততক্ষণে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছি। জাহান্নামে যাকগে আকাশের সীমানা-ফিমানা, এখন আশ্রমের ছেলে আশ্রমে ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায় আশ্রম, কোথায় সাঁওতাল-গ্রাম! একই জায়গায় চক্কর খাচ্ছি, না, কোন একদিকে এগিয়ে যাচ্ছি তাই আল্লার মালুম।

এমন সময় কানের কাছে শুনি—

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কেমন যেন এক আর্তরব! একটানা নয়, থেমে থেমে। কেমন যেন—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফীঈঈঈ-ৎ!

ভয়ে ছুট লাগাবার চেষ্টা করলুম! সেই ফিঁৎ ফিঁৎ যেন কলরব করে উঠে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল—ফীঁৎ, ফীঁৎ!

ইয়া আল্লা, ইয়া পয়গম্বর, ইয়া মৌলা আলীর মুরশীদ। বাঁচাও বাবারা, এ কী ভূত, না প্রেত, না ডাইনী!

হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম গড়গড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূতুড়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপার কী!

আস্তে আস্তে ফের রওনা দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ—প্রথমে ক্ষীণ, আমি যত জোরে চলতে থাকি শব্দটাও সঙ্গে সঙ্গে জোরালো হতে থাকে। প্রথমটায় আস্তে আস্তে—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ। আমি যত জোর চলতে আরম্ভ করি শব্দটাও দ্রুত-তর হতে থাকে—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ।

আর সে কী প্রাণঘাতী, জিগরের খুন-জমানেওলা শব্দ!

যেন কোন কঙ্কালের নাকের ভিতর দিয়ে আসছে দীর্ঘনিশ্বাস—কখনও ধীরে ধীরে আর কখনও বা দ্রুতগতিতে। একদম, আমার সঙ্গে কদম কদম বাঢ়হায়ে যাচ্ছে, আমার কানের কাছে যেন সেঁটে গিয়ে, লম্বা লম্বা হাতের আঙুল দিয়ে কানের পর্দাটা ছিঁড়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গুরুদেবের 'কঙ্কাল' গল্পটা। কিন্তু গুরুদেব মহর্ষির সন্তান; তিনি ভয় পাননি। বেশ জমজমাট করে খোশগল্প করেছিলেন কঙ্কাল আর ভূতের সঙ্গে। আমি পাপী—নেমাজ-রোজা নিত্য নিত্য কামাই দিই।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন আমার গলার টুঁটি চেপে ধরল।

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। দেখি, যেন আমার চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ তারা ফুটে উঠেছে। কিন্তু হলদে রঙের। প্যোর কোলমান্‌স্‌ মাস্টার্ড।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, বলতে পারব না।

যখন হুঁশ হল তখন গায়ে লাগল পূবের বাতাস। তারই উলটো দিকে চলতে আরম্ভ করলুম। ওই রকম যদি চলতে থাকি, তবে একদিন না একদিন আশ্রম, ভুবনডাঙা কিংবা রেল-লাইনে পৌঁছবই পৌঁছব।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে সেই—ফিঁৎ ফিঁৎ ফিঁৎ।

কিন্তু এবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢিপিতে উঠতেই দেখি—উত্তরায়ণ। তারই বারান্দায় গুরুদেবের সৌম্য মূর্তি। টেবিল-ল্যাম্পের পাশে বসে মিশ্রজীর সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি চিৎকার করে উঠলুম—

ওয়া গুরুজীকী ফতে।

গুরুর জয়, গুরুদেবের জয়।

তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। তাঁরই কৃপায় রক্ষা পেয়েছি।

কিন্তু ওয়া গুরুজীকী ফতে বেরিয়েছিল—ওবা গরজীকী ফত হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে, চাপা সুরে।

ততক্ষণে ধড়ে জান ফিরে এসেছে।

শব্দটা তবে কিসের ছিল ?

বাঁশীর। আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে হাওয়া ঢুকে ফিঁৎ ফিঁৎ করছিল। জোরে চললে হাত ঘন ঘন দোলা খেয়েছে, ফিঁৎ ফিঁৎও জোরে বেজেছে। আস্তে চললে, আস্তে আস্তে।

বাঁশীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। শেষবারের মত ফিঁৎ করে কাতর আর্তনাদ ছেড়ে সে নীরব হল।

আমি আর কলাবৎ হবার চেষ্টা করিনি।

গুরুদেব যখন গেয়েছেন—

'বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে ?'

তখন আমার কথা ভাবেননি।

॥ ভেন্দেত্তা ॥

এই নামে প্রকাশিত মপাসাঁর একটি ছোটগল্প বহু পাঠকের সুপরিচিত। কর্সিকার এক বুড়ীর একমাত্র ছেলেকে খুন করে আততায়ী সার্দিনিয়া পালিয়ে যায়। বুড়ী প্রতিশোধ নেবার জন্য খড়ের মানুষ তৈরি করে প্রথমটায় তার গলার ভিতর মাংস রেখে কুকুরকে ট্রেন করে, কি করে তার গলা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে হয়, পরে মাংস বাদ দিয়ে। ট্রেনিং শেষ হলে বুড়ী সার্দিনিয়া গিয়ে সেই কুকুরকে দিয়ে পুত্রের আততায়ীকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ায়।

* * *

এবারের ঘটনাটি অতখানি রগরগে না হলেও বড় বিষাদময়। অকুস্থল ঐ কর্সিকারই কাছে, তবে সমুদ্রের ওপারে উত্তর ইতালির জনপদভূমিতে। কাল : ১৫ই জুলাই, ১৯৪৪। যুদ্ধের শেষের দিক।

মিত্রপক্ষে ও জর্মনিতে তখন ইতালি দেশেও জোর লড়াই চলছে। এবং জর্মনদের পিছনে ইতালীয় গেরিল্লারা (এদের কিছুটা কম্যুনিস্ট; বাকিরা ফ্যাসিস্ট ও নাৎসি-বিরোধী) যেমন জর্মনদের বিরুদ্ধে তীব্র গোপন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তেমনি আপন দেশবাসী ফ্যাসিস্ট এবং জর্মন-মিত্রদের বিরুদ্ধেও। এবং দেশবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইটাই হয়ে উঠেছিল তীব্রতর, তিক্ততর। রাজনৈতিক দলাদলির নাম করে সবাই আপন আপন শত্রু নিধনে লেগে গিয়েছে। ইতালি প্রতিশোধের দেশ এমনিতেই—আইন-আদালত থাকাকালীনও, আর এখন তো কথাই নেই।

১৫ জুলাইয়ের সকাল বেলা উত্তর ইতালির ছোট গ্রাম মন্তালবাতে দশ বছরের মেয়ে আল্ফা জুবেল্লি বাড়ির সামনের বাগানে সঙ্গিনীদের নিয়ে খেলাধুলো করছিল। এমন সময় আচমকা বাড়ির গেট খুলে কয়েকজন গেরিল্লা বাগানে ঢুকলো। গুলি করার জন্য তৈরি তাদের কাঁধে ঝুলছে টমিগান। একজন সেই ছোট্ট মেয়েটিকে শুধলো, 'তোর মা কোথায় ?'

ভয়ে আল্ফার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ফ্যালফ্যাল চোখে বাড়ির দিকে সে তাকিয়ে রইল স্থাণুবৎ।

কয়েক মিনিট পরে গেরিল্লারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তাদের মাঝখানে আল্ফার মা—পরনে তখনো রান্নাবান্না করার সময়কার এপ্রন। এবং আল্ফার কাকা—আল্ফার বাবাকে ইতি-পূর্বে ইতালি সরকার জর্মনদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী জর্মনিতে শ্রমিক হিসেবে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে। চেঁচাতে চেঁচাতে আল্ফা মায়ের গা জড়িয়ে ধরতে গেরিল্লারা গুণ্ডার মতো তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। কাঁদতে কাঁদতে সে তাদের পিছনে পিছনে ছুটলো। প্রায় একশ গজ দূরে গিয়ে গেরিল্লারা আল্ফার মা আর কাকাকে একটা বাড়ির দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করালে। আল্ফা দেখল, টমিগানগুলো গর্জন করে উঠলো আর তার মা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

লাশের গায়ে গেরিল্লারা এক টুকরো কাগজ পিন্ করে দিয়ে পাহাড়ে উধাও হয়ে গেল। কাগজে লেখা ছিল, 'নাৎসি গুপ্তচরের এই গতি।' নিচে স্বাক্ষর ছিল 'স্তেল্লো'।

এই নৃশংসতায় ছোট্ট গাঁটি শিউরে উঠলো। আর এই 'স্তেল্লো'টি কে তাকেও সমস্ত গাঁ চেনে। ত্রিশ বছরের কম্যুনিস্ট আউরে-লিয়ো বুস্সি। গ্রামের লোক আরো জানতো, পাশের ছোট্ট

শহরের ঐ বুস্‌সি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার পূর্বে প্রায় এক বছর ধরে—স্বামী যখন বিদেশে—সিন্নোরা জুবেল্লির প্রণয় কামনা করে নিরাশ হয়েছে। এবং সবচেয়ে ভালো করে গ্রামের লোক জানতো, সিন্নোরা জুবেল্লি বা তার দেওর কখনো জর্মনদের গুপ্তচরের কাজ করেনি—এসব অজ পাড়াগাঁয়ে একে অন্যের হাঁড়ির খবর জানা থাকে। আসলে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যর্থ-প্রেমিক আউরেলিয়ো বুস্‌সির খুনিয়া প্রতিহিংসা।

কিন্তু তখন কোথায় আদালত? কিসের আইন? কে দেবে সাজা? ভ্রাতৃযুদ্ধ, গৃহবিবাদ চলে আপন 'আইনে'।

মায়ের মৃত্যুর পর আল্‌ফার আত্মীয়দের কাছে আল্‌ফা আশ্রয় পেল। মাসের পর মাস বেচারী কথা প্রায় বলেইনি। নির্জনে চোখের জল ফেলে ফেলে তার দিন কাটলো।

যুদ্ধ শেষ হল (১৯৪৫ এপ্রিল)। গেরিল্লারা নিজেদের নিজেরাই দেশের ত্রাণকর্তা বানিয়ে বিজয়োল্লাসে মত্ত হলেন। কে তখন শুধোয় যুদ্ধের সময় কে কোন্ অন্যায় কোন্ ন্যায় করেছে, কি না করেছে? হিটলারের ফেউ মুসোলিনি আর তার রক্ষিতা ক্লারা পেতাচ্চিকে গুলি করে মেরে মিলান শহরে এনে পায়ের গোড়ালিতে দড়ি বেঁধে ল্যাম্প-পোস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তাদের কেটে ফেলে নর্দমায় ফেলা হল। ইতালির লোক মৃত দেহ দুটোকে লাঞ্ছনা অবমাননার একশেষ করলে।

আল্‌ফা বড় হচ্ছে। দেখতে দেখতে সে খাঁটি ইটালিয়ান সুন্দরীর রূপ নিল। কিন্তু তবু সে রইল আগেরই মতো নির্জীব এবং প্রায়ই শোনা যেত রাত্রে ঘুমের ঘোরে বুক-ফাটা কান্নার সঙ্গে মাকে ডাকছে।

মনে হল এ মেয়ে জীবনে কখনো তার মায়ের নৃশংস অপঘাত মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছবি মনের পট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

এবং আরেকটা নাম সে কখনো তার স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না—আউরেলিয়ো বুস্‌সি—তার মাতৃহন্তা। বয়েস তার যতই বাড়তে লাগল, শান্ত বুদ্ধির বিকাশ হতে লাগল, ততই তার হৃদয় এবং মনে গভীর হতে গভীরতর রেখায় জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠতে লাগলো একটিমাত্র শব্দ : প্রতিহিংসা। এবং দিনের পর দিন প্ল্যান কষা—কি করে সে প্রতিহিংসা কার্যে পরিণত করে মায়ের নির্মম নৃশংস পাপিষ্ঠ হত্যাকারীকে তার দাদ দিতে হয়।

তারপর কয়েক বৎসর গেল এবং মনে হল আল্‌ফা বুঝি ১৫ই জুলাই ১৯৪৪ সালের ঘটনার কথা শেষ-মেশ ভুলে গিয়েছে। তার সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেল। সে তার সখীদের সঙ্গে নাচের মজলিসে যেতে আরম্ভ করলো। সেখানে এক ছোকরা কেরানী রিকো বাসাদন্নার সঙ্গে পরিচয় ও ক্রমে প্রণয় হল। ১৯৫৫ সালের মধু নিদাঘে তার বিয়ে হল। মনে হল, এবারে সব-কিছু ভালোর দিকেই যাবে—আর ভাবনার কারণ নেই। সুখী তরুণী সুন্দরী স্বামী-সোহাগিনী, আর্থিক সচ্ছলতা, সব-কিছুই। কিন্তু তার হৃদয়ের ভিতর কি চলছে সেটা কেউ দেখতে পেল না। তার মায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে সে কাউকে একটি মাত্র কথা বলতো না—এমন কি তার স্বামীকেও না। কিন্তু প্রতিহিংসার কঠোর, অলঙ্ঘ্য আহ্বান তার হৃদয়ে প্রতিদিন তীব্রতর স্বরে ধ্বনিত হ'তে লাগল। পরে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা রায় দেন। এই আহ্বান আল্‌ফাকে ম্যানিয়াতে (বায়ুগ্রস্ত) পরিণত করে তুলেছিল, এবং এই প্রতিহিংসা-ম্যানিয়া তার স্ত্রীজনসুলভ তাবৎ হৃদয়বৃত্তিকে চাপা দিয়ে ফেলেছিল।

তারপর একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সব কিছু পালটে গেল—চরম ক্ষণ এসে আল্‌ফার জীবনের নূতন অধ্যায় খুলে দিল। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে আল্‌ফার স্বামী উত্তর ইতালির কারখানা-কেন্দ্র তুরিন শহরের কাছে বদলি হল।

অদ্ভুত যোগাযোগ। একদিন দৈবাৎ আল্‌ফা খবরের কাগজে দেখে তার সেই সুপরিচিত জঘন্য নাম—আউরেলিয়ো বুস্‌সি!

সেই সেদিনকার গেরিল্লা নিকটবর্তী ছোট্ট শহর ক্লেভালকুয়োর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে।

সিন্নোরা আল্‌ফার বয়স তখন একুশ-বাইশ।

কেউ জানে না, আল্‌ফা যেদিন প্রথম খবরের কাগজে তার মাতৃহন্তার নাম দেখল তখন তার মনে কি চিন্তা উদয় হয়েছিল। পূর্বেও এ-বিষয় নিয়ে সে কখনো কারো সঙ্গে আলোচনা করেনি। আজও করলো না। বস্তুত ভবিষ্যতে যখন সমস্যা তার কঠিনতম রূপ নিয়ে চরম সময়ে পৌঁছল তখনো সে ঐ নিয়ে কারো সঙ্গে সামান্যতম আলোচনা করেনি।

শুধু তার স্বামী লক্ষ্য করলো, আল্‌ফা আবার গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

আল্‌ফা আবিষ্কার করেছিল তার মাতৃহন্তা আউরেলিয়ো বুস্‌সির নাম জানুয়ারী মাসে (১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এরপর মার্চ অবধি সে গম্ভীর।

মপাসাঁর নেক্‌লেস গল্পে মাতিল্‌দ্‌ কী কঠোর পরিশ্রম করে হারানো নেকলেসের দাম তুলেছিল তার বর্ণনা আছে মাত্র কয়েকটি ছত্রে—দশ বছরের নিদারুণ খাটুনির নিখুঁত ছবি। মপাসাঁ যদি এই তিন মাসের কাহিনীটি লিখে যেতেন তবেই এর প্রতি সুবিচার হত। এ কাহিনীর রিপোর্টার কার্ল রাও উত্তম রিপোর্টার, কিন্তু তিনি তো মপাসাঁ নন।

অবশেষে মার্চ মাসের (১৯৫৬) সন্ধ্যার দিকে নাটকের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হওয়ার লগ্ন এল।

আল্‌ফা তার স্বামীর পিস্তলটি দেরাজ থেকে বের করে ওভার-কোটের পকেটে পুরলো। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল

বাড়ি থেকে। বাস ধরে রওয়ানা দিলে ক্লেভালকুয়োরের দিকে—যেখানে বুস্‌সি মাত্র তিন মাস আগে ম্যুনিসিপাল চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। সামান্য কয়েক মাইলের রাস্তা।

অতি শান্ত, দৃঢ় পদক্ষেপে আল্‌ফা ম্যুনিসিপাল আফিসে গিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে। ঐ তো সে! যাকে সে বারো বছর ধরে খুঁজছে।

আর তার ভাবনা নেই।

আল্‌ফার হাত কাঁপেনি। পিস্তলটি পকেট থেকে বের করে ছটি গুলি চালিয়ে দিলে চেয়ারম্যান সাহেবের বুকের ভিতরে। আউরেলিয়ো বুস্‌সি তার পায়ের কাছে যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লেন।

কয়েক মিনিট পরেই আল্‌ফাকে দেখা গেল পাশের থানায়।

"আমাকে অনুগ্রহ করে গ্রেফ্‌তার করুন। আমি আউরেলিয়ো বুস্‌সিকে গুলি করে মেরেছি।"

এ ছাড়া পুলিশ তার কাছ থেকে একটি বর্ণও বের করতে পারেনি। মাত্র ঐ একটি শব্দ।

উত্তেজনায় তার মুখ পাংশু বটে, কিন্তু চোখে তখনো জল এল না, যখন পুলিশ তাকে হাতকড়ি পরিয়ে হাজতে নিয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ পরেই ভেরচেল্লি শহরে আল্‌ফা জজদের সামনে দাঁড়িয়ে। চৌদ্দদিন ধরে মোকদ্দমা চলেছিল। সমস্ত ইতালি দেশ প্রচণ্ড আবেগ, রাগ দুঃখ বেদনার সঙ্গে এই মোকদ্দমার যেন আপন আপন ভাগ নিলে। সেই পুরনো রাজনৈতিক দলাদলি আবার নূতন করে দেখা দিলে। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির চেয়ে বড় হয়ে উঠলো মানুষ আল্‌ফা জুবেল্লির দশ বছর বয়সের নিদারুণ অভিজ্ঞতা। তখন তার বয়েস দশ। আজ সে প্রতিশোধ নিয়েছে। সে শান্ত,—হাকিমদের দিকে নির্ভয়ে তাকায়।

পাছে না বুস্‌সিপক্ষ আল্‌ফাকে খুন করে, তাই পুলিশ বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল।

মোকদ্দমা শেষ হল। 'কেস্ আল্‌ফা জুবেল্লি।'

কিন্তু এ কেস্ রাজনৈতিক দলাদলির মোকদ্দমা নয়। তার বহু বহু উর্ধ্বে। শিশু তার মায়ের খুনীর উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। এই সব কথা! এবং এই বহু কথা!

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা সাক্ষী হিসেবে বললেন, মায়ের অপঘাত মৃত্যু দেখে ঐ বয়েসের ছোট্ট মেয়ের মনে যে গভীর দাগ কাটে সেটা মোছবার মতো নয়! তার সমস্ত নার্ভস উল্টেপাল্টে গেছে। এমন কি শরীরের দিক দিয়েও তার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। মাতৃত্বের আনন্দ থেকেও সে বঞ্চিতা হয়ে গিয়েছে।

আদালত ঘরের অসহ্য উত্তেজনা ও প্রতীক্ষার ভিতর হাকিমরা রায় দিলেন—পাঁচ বছরের জেল, এবং তারপর এক বৎসর মনস্তত্ত্ব হাসপাতালে পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা।

সোজা পায়ে কঠিন কদমে আল্‌ফা দুই পুলিশের মাঝে আদালত পরিত্যাগ করলো। দুনিয়ার ভিড়ের উপর দিয়ে সে যেন তাকিয়ে আছে, দূরে, বহু দূরে। তার ছোট্ট গ্রাম সেই মন্তান্বার দিকে—যেখানে সে দেখেছিল তার মা কি ভাবে টমিগানের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

তারপর পাঁচ বৎসর কাটালো আল্‌ফা উত্তর ইতালির এক জেলে। প্রতি সপ্তাহে—এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর—তার স্বামী তার সঙ্গে দেখা করার জন্য জেলে যেত। তার স্বামী রিকো বাসাদন্না প্রতিবারে এসে বন্ধুবান্ধবদের খবর দিত, আল্‌ফা শান্ত এবং সন্তুষ্ট। ভদ্রলোক অদ্ভুত একদারনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে যা সম্ভব তাই করে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি তুরিন শহরে বদলি হয়ে সেখানে নূতন বাসা বেঁধেছেন; প্রতি সপ্তাহে আলফাকে এই

নূতন নীড়ের খবর দেন। আর কত দিন! আর বেশী দিন নয়! তোমার জন্য সব তৈরী। তুমি বেরিয়ে এলেই হল।

১৯৬১ সালের জুন মাসে আল্‌ফার জেলবাস খতম হল। কিন্তু তারপর তাকে যেতে হল দক্ষিণ ইতালিতে হাসপাতালে, তুরিন থেকে প্রায় ১৮৮০ কিলোমিটার দূরে। সেখানে তার স্বামী প্রতি সপ্তাহে দেখতে যেতে পারে না। কিন্তু মাসে একবার করে যায়, শুধু তাকে বলবার জন্য যে সে তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে।

৮ই নবেম্বর, ১৯৬১, আল্‌ফাকে হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ডেকে পাঠালেন হাসপাতালের বড় ডাক্তার। অধ্যাপক জুলিয়ো ক্রেদা। খবর দিলেন আল্‌ফার আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সাত মাস পূর্বেই সে খালাস। তার জিম্মাদার অধ্যাপক। সে যেন বাড়ি চলে যায়।

হাজার মাইল দূরে তুরিনে আল্‌ফার স্বামী রিকো বাসাদন্না বেতারে শুনলে তার স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত মুক্তি। কিন্তু বেচারী এই হাজার মাইল যায় কি করে। আল্‌ফা তো ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়বে।

হাসপাতাল থেকে সেই সন্ধ্যেয় যখন আল্‌ফা বেরলো, তখন খবরের কাগজের রির্পোটাররা তার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

"আমি আমার নিরপরাধ মায়ের অহেতুক মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তার প্রায়শ্চিত্তও (penanco) করেছি। আমি সন্তুষ্ট এবং মুক্ত। এখন আমি আমার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। নূতন জীবন আরম্ভ করবো। অতীতের করাল ছায়া আমার মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

আমাকে দয়া করে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না।"

* * *

বিশ্বাস করবেন না, খবরের রিপোর্টাররা এই গভীর মনো-

বেদনার বাণী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিল। তারা তাকে একটি-মাত্র প্রশ্ন শুধোয়নি।

পরের দিন সকালবেলা ডাক-গাড়িতে করে সে তুরিনে পৌঁছল। প্ল্যাটফর্মে তার স্বামী আর ননদীর সহ্যের সীমা বুঝি পৌঁছে গেছে। তার স্বামী তাকে আলিঙ্গন করলে। আল্‌ফা যেন সে মুক্তির বন্ধন থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি নিতে চায় না।

* * *

এরপর সংবাদদাতারাও বলেছেন, "এই মুক্ত বাতাসের স্বাধীনতার মানবজীবনের একটি নিদারুণ ট্র্যাজেডি শেষ হল।"

তিনি প্রশ্ন শুধোচ্ছেন, "এইখানেই কি শেষ? পারবে কি আল্‌ফা নূতন করে জীবন পত্তন করতে? মন্তাম্বার করাল ছায়া কি তার স্মৃতিকে বিমূঢ় করবে না? ব্যবস্থা তো তার স্বামী সব তৈরী করে রেখেছে। কিন্তু—

এমন কি ইতালির খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত আল্‌ফা সম্বন্ধে কিছু লেখে না। তাকে চান্স দিতে চায়। যে মেয়ে তখনি শুধু শান্তি পেল যখন সে তার মাতৃহন্তাকে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে দেখলেন।"

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব—লাও ঝটপট—রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়রে মূর্খ। সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীরখানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।
(ওমরখৈয়াম)

[কাহিনীটি বেরিয়েছে সুইস্‌ কাগজ ভেণ্টভখতে; আমি মোটামুটি অনুবাদ করেছি।]

॥ বিষের বিষ ॥

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা—ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাতসকাল ভোর বেলা থেকে ক্যাট্‌ক্যাট্‌ আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনসে', 'হাড়হাভাতে', 'ড্যাকরা'—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশ বার শুনতে হয় না। আর গয়না-গাটি নিয়ে গঞ্জনা—সে তো নিত্যিকার রুটি পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয় সে সব-কিছু চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বীবীজানের নেই। আগা আহমদ দিন-মজুর; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল বিয়ের বিশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরমুরে রুটি ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেলতেলে আচার।

সে রাত্রে আগা আহমদ খেল না। বউ ঝঙ্কার দিয়ে বললে, 'ও আমার লবাব-পুত্তুর রে—রুটি পনীর ও'য়ার রোচে না। কোথায় পাব আমি কাবাব আণ্ডা আমার আগাজানের জন্যে—'

সেই কাবাব আণ্ডা! যা বউ নিজে খেয়েছে!

স্থির করলো, ওকে খুন করবে। নূতন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অন্তত একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়াপ্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে,

'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তার পর ওর সঙ্গে সহবাস ব্যভিচার।' আর থাকলেই বা কি হত? কেউ কি আর সাহস করে আসত? আগা আহমদের মনে পড়ল, গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসেনি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকাল বেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কঞ্চি কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতা-পাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললে, 'গা-টা ম্যাজ ম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে?'

বউ তো খল খল করে হাসলে চোঁচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোজ্জাবো, মা—মিনসের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছে।'

আগা আহমদ নাছোড়বান্দা। বহু মেহন্নৎ করে গা-গতর পানি করে গর্তটা তৈরী করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিলে এক মোক্কম ধাক্কা। তারপর ফের বাঁশ-কঞ্চি লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহমদ তার পীর মুরশীদকে 'শুক্‌রিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হল। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুঁটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগা রান্না-বান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলে। ক্যাটক্যাটানী না শুনে না শুনে আজ তার চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যত বার ভাবে ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক্—তার বউতো বটে। তাকে ওরকম মেরে ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরত মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেয়নি যে তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে? কিন্তু ওদিকে আবার সেই দুশমনটাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এই অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে আগা আহমদও তাই করলে। 'যাক্‌গে ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখের পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার! 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য! এ তো মালিকা খানমের গলা নয়। আরো পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আগা আহমদ দেখে—বাপরে বাপ, এ্যাব্বড়া কালো-নাগ, কুলোপানা-চক্কর-গোখরো সাপ! সে তখনো চেঁচাচ্ছে, 'বাঁচাও, বাঁচাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি, আমি তোমাকে রাজা করে দেব।'

সম্বিতে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল। সাপকে বললে, 'তা তুমি তো কত লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে অত ভয় কিসের?'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললে, 'ধ্যত্তর তোর প্রাণ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে! আমাকে বাঁচাও এই দুশমন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে।' তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাটক্যাট কী বকাটাই না দিয়েছে। আমি ড্যাকরা, আমি মদ্দা মিনসে হয়ে একটা অবলা—

হ্যাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোন সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরবার কোনো পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আগা আহমদ বললে, 'তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন?'

চিল চ্যাঁচানি ছেড়ে সাপ বললে, 'আমি ছোবল মারব ওকে! ওর গায়ে যা বিষ তা দিয়ে সাত লক্ষ কালনাগিনী তৈরী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না? সারাতো কোন ওঝা? ওসব পাগলামি রাখো। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেব। পশুপক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদশা সুলেমানের কসম।'

রূপকথা নয় সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একবারও স্বামীকে কোনো কড়া কথা বলেনি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুলশয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললে, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে সুলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সেও শুধরে গেছে জানিয়ে অনেক কিরে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, 'গুপ্তধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজের পথ তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি। শহর কোতয়ালের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে

ছাড়াবার জন্য কাছে আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এন্তের ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রাম নাম ?
সাপের দ্বারা ভালো কাম ?

শহরে এমনই তুল-কালাম কাণ্ড যে তিন দিন যেতে না যেতে সেই বনের প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পৌঁছল কোতয়াল-নন্দিনীর জীবন-মরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। কোতয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেঁষছে না, বলছে, উনি মা মনসার বাপ।

প্রথমটায় তো আগা আহমদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বদ্যি হদ্দ হল, এখন ফার্সী পড়ে আগা ? কী বা বেশ, কী বা ছিরি !

কোতয়ালের কানে কিন্তু খবর গেল,
বন থেকে এসেছে ওঝা
পেটে এলেম বোঝা বোঝা।

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরী—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তার পর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকামাত্রই সে কাল-নাগ কোথা দিয়ে যে বেরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতয়াল নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ দর্শন কোতয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন

বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তার বাড়ির পাশের বনের ফরেস্ট অফিসার। এইবার আগা দু'বেলা প্রাণ ভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তা ছাড়া এখন তার বিস্তর দাসী-বাঁদী। ওদের তম্বী-তম্বা করতে করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন্ সাপ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোন্‌টা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটেছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে,

হাতের কাছে ওঝা
সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে, অতি লোভ ভালো না—সাপ সরাতে একবারের বেশী না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার-বক্সী ততই বলে, 'হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমন ধারা কখনো হয়।'

আগাকে জোর করে পাল্কিতে তুলে দেওয়া হল।

এবার সাপ জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার খাই বড্ড বেড়েছে—না? তোমাকে না পইপই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশী আসবে না। তবু যে এসেছ? তা সে যাক্‌গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মত

ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষ বার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচ শ ঘোড়ার মনসব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মত শুকিয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে আর সে ছোবল খেয়ে মরে। স্থির করলো, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতয়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্যায়ন, হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মুকুট। চলো শিগ্‌গির! সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতয়ালের পা। হাউহাউ করে কেঁদে নিবেদন করলে সে কোন্ ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতয়ালদের হৃদয় মাখন দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহর-দারোগাকে হুকুম দিলেন, 'চিড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জিরামে।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু পাশের লোক তার জয়ধ্বনি জিন্দাবাদ করছে। এক ঝরোকা থেকে কোতয়াল-নন্দিনী, অন্য ঝরোকা থেকে উজীর-জাদী তাঞ্জামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদমৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে।

স্বয়ং বাদশা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিস, হতভাগা? এবার আর আমার কথা নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুল্লে বিষ।'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুণতি দৌলত দিয়েছো। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম, তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বীবী মালিকা খানম আমাকে বলেছিলেন তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন। বোধ হয় এক্ষুণি এসে পড়বেন। তুমি তো ওঁকে চেনো—হেঁ, হেঁ—তাই ভাবলুম, তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি—তুমি আমার—'

'বাপরে, মারে' চিৎকার শোনা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

এর পর আগা আহমদ শান্তিতেই জীবন যাপন করেছিল।

গল্পটি নানা দেশে নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানী সদাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাঈ-তে শুয়ে শুয়ে।

কাহিনী শেষ করে সদাগর শুধোলেন, 'গল্পটার 'মরাল' কি, বলো তো?'

আমি বললুম, 'সে তো সোজা। রমণী যে কি রকম খাণ্ডারী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-দুনিয়ার নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদাগর বললেন, 'তা তো বটেই

কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে 'মরাল' থাকে। এই যে-রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখাবার, একটা চিবোবার। দেখাবার 'মরাল'-টা তুমি ঠিকই দেখেছ। অন্য 'মরাল'টা গভীর ঃ—খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে-কোনো কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না। কারণ খল তার পরই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো।

অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মত বিষ থাকে তবে অন্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন, ক'জনের আছে ও-রকম বউ?

সমাপ্ত

